সুইটহার্ট-২

কাজী এহসানউল্লাহ

সুবর্ণা



সুবর্ণা লাভস্টোরী

সুইটহার্ট-২

কাজী এহসানউল্লাহ্

শিমুল (সুইট হার্ট—১) আমেরিকাতে চলে গেলো। সোনিয়া বিমানবন্দরে কেঁদে বুক ভাসালো। কিন্তু তারপর কি হলো ওদের ?

শিমুল কি পেরেছিলো সোনিয়াকে ক্ষমা করতে ? সোনিয়া কি বুকে ধরে রাখতে পেরেছিলো শিমুলকে ?

কিন্তু নীপাভাবীর কি হলো ? উদ্ভিন্না যৌবনা মেয়েটার যৌবনের হাল কে ধরবে ? শুধু কাহিনী নয়, শিমুলের আমেরিকার জীবন সম্পর্কেও জানতে পারবেন। আমেরিকাতে গিয়ে সত্যই কি বাংলাদেশী তরুণেরা সুখী হয় ? সোনিয়া, পাগলী মেয়েটা শিমুলের খোঁজে একদিন গিয়ে পৌঁছালো সুদুর আমেরিকাতে, কিন্তু তারপর···

সুবর্ণা প্রকাশ কুটির
২৭, শিরিশ দাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা—১১০০।

বিক্রয় ঃ মোঃ মাসুদ খান
২৭ শিরিশ দাস লেন,
ঢাকা—১১০০।

লেখকের কথা

সুইট হার্ট—২ কখনও লিখতে হবে ভাবিনি। ভেবেছিলাম, শিমুলের চলে যাওয়া নিয়েই আমার পাঠক পাঠিকা সন্তুষ্ট থাকবেন। তারপর কি হলো, ঘটনাটা নিজেরাই নিজেদের পছন্দ মতো সাজিয়ে নেবেন। কেউ মিল দিবেন, কেউ বিচ্ছেদ টানবেন—যার যা ভালো লাগে।

কিন্তু না, এ পর্যন্ত সতেরশ' পঁচাত্তরটা চিঠি পেয়েছি, যারা পরবর্তী ঘটনাটা সাজিয়ে দেবার বিপজ্জনক দায়িত্বটা আমাকেই দিয়েছেন। বিপজ্জনক তো বটেই, কারণ আমার সাজানো ঘটনা তো আপনার মনের মতো না-ও হতে পারে।

তবে চেষ্টা করেছি। আপ্রাণ খেটেছি। আর সঙ্গে নিয়েছি আপনাদের সবগুলি পরামর্শ। তবে বেশির ভাগ পাঠিকা সোনিয়াকে আমেরিকা পাঠাতে বলেছেন, আর কিছু পাঠক শিমুলকে দেশে ফিরিয়ে আনতে বলেছেন। কিছু পাঠক পাঠিকা শিমুলকে বাদ দিয়ে অন্য কারো সাথে সোনিয়ার বিয়ে দিতে বলেছেন। আবার অনেকে শিমুলকে সোনিয়ার জীবন থেকে স্থায়ীভাবে মুছে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। তবে মিল দিতে বলেছেন এমন চিঠির সংখ্যাও নগণ্য নয়।

আমি কি করেছি? আপনিই ভেবে দেখুন, কতবড় সমস্যা সৃষ্টি করেছেন আপনাদের চিঠিতে পরামর্শ দিয়ে। নিজের মতো করে কাহিনীটা সাজাতে পারলাম কোথায়?

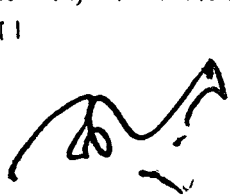
এমন একটা জায়গায় শেষ করলাম (মিল ও অমিল পরামর্শ দাতা) যেখানে আপনারা উভয়েই সন্তুষ্ট হবেন। যারা বিচ্ছেদ

ভালোবাসেন তারা ধরে নেবেন এর পর আর কখনও শিমুল ও সোনিয়া কাছাকাছি হয়নি। আর যারা মিল পছন্দ করেন তারা ধরে নেবেন এর পর শিমুল দেশ থেকে ফিরে গিয়ে নিশ্চয়ই সোনিয়াকে বুকে টেনে নেবে।

আমার যে এতো সংখ্যক প্রিয় পাঠক পাঠিকা আছে, আগে জানতাম না। একটা বইয়ের অনুরোধে এতো চিঠি আসবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তাই তো প্রিয় চিঠি লেখক লেখিকার মনে কষ্ট দিয়ে সরাসরি (মিল বা অমিল) কোনো পক্ষকে চটাতে সাহসী হলাম না। আপনারা যারা চিঠি দিয়েছেন, সবাইকে ধন্যবাদ এবং আমাকে আরো উৎসাহ দিয়ে লেখার আহ্বান জানাচ্ছি। সময় ও অর্থের অভাবে ব্যক্তিগত ভাবে উত্তর দিতে পারি না, তাই মনে কষ্ট নিবেন না।

তবে পাঠক পাঠিকার একটা অনুরোধ আমি ১০০ % রেখেছি। এরা সবাই নীপা ভাবীর একটা হিল্লে করে দিতে বলেছিলেন, দিয়েছি। কার সঙ্গে? বলবো না। পড়ে দেখুন, আমি নিশ্চিত, আপনি এমনটিই মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন (অবশ্য অনেকেই প্রস্তাবটা সরাসরি পাঠিয়েছেন)।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাবৃন্দ, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। বিশেষভাবে যারা পত্র দিয়ে আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন, তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আবারও লিখবেন এই প্রত্যাশায়।



(কাজী এহসানউল্লাহ)

সুবর্ণা লাইব্রেরী

মুইট হার্ট—২



কাজী এহসানউল্লাহ



প্রকাশক : কাজী এহসানউল্লাহ
সুবর্ণা প্রকাশ কুটির
শিরিশ দাস লেন, ঢাকা।

স্বর্বস্বত্ব : প্রকাশকের

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : কাজী এহসানউল্লাহ
প্রচ্ছদ মোঃ মনোয়ার হোসেন
কাহিনী : সম্পূর্ণ মৌলিক
প্রকাশ আগষ্ট, ১৯৯২
মুদ্রণ সাজু প্রিন্টিং প্রেস
প্রোডাঃ : মোঃ মাসুদ খান
সেল্‌স মোঃ আশরাফুল করিম
সেলস্‌ মোঃ মাসুদ খান
(ডাকযোগে)
২৭ নং শিরিশ দাস লেন
বাংলাবাজার
ঢাকা—১১০০।

এক

আমি কাঁদছি।

চোখ দিয়ে অনবরত পানি গড়াচ্ছে। নির্দিষ্ট করে বলতে পারবো না—কার জন্য কাঁদছি? জীবনে প্রথম দেশ ছাড়ছি। ঝিরাট লৌহ দানবটা আমাকে শুন্যে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি সিমুল, আমেরিকা যাচ্ছি।

বার বার মায়ের মুখটা মনে পড়ছে, সহজ সরল আমার মা। ছোট থেকে যত আব্দার সব মায়ের কাছে করেছি। মাকে অনেক জ্বালিয়েছি। মা কোনদিন রাগ করেননি। মুহূর্তেই রাগ ভুলে বুকে টেনে নিয়েছেন। সেই মাকে ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি।

নিপা ভাবী, বিচিত্র এক ব্যক্তিত্ব। নিপা ভাবী আমাকে এতো ভালবাসতো আগে বুঝিনি। এয়ারপোর্টেই প্রথম বুঝলাম। নীপা ভাবী আমার দু'হাত ধরে অঝোরে কাঁদলো। বার বার আমাকে সব ভুলে নতুন জীবন শুরু করার অনুরোধ করেছে। নীপা ভাবীর শুকনো মুখটা চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠছে।

বাবা, আমার চির-গম্ভীর বাবা। কি ভীষণভাবে রেগেছেন আমার উপর। আমাকে লাথি মেরে ঘর থেকে বের করে দিলেন। একটি বার মায়ের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে দিলেন না। চলে আসার

সময় মায়ের সঙ্গে দেখা হলো না। এই মুহূর্তে আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ এটাই। মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলে বোধহয় এতো কান্না পেতো না।

আমার পাশে বসেছেন একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। তিনি বার বার আমার দিকে দেখছেন। আমাকে ঘন ঘন চোখ মুছতে দেখে হয়তো বিব্রত হচ্ছেন।

জন্মভূমি ছেড়ে যেতে এতো কষ্ট আগে কখনও বুঝিনি। সেই ছোট্টটি থেকে যে মাটিতে মানুষ হয়েছি, আজ সেই মাটি ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি, দূরে—বহুদূরে। যেখানে নবান্নের উৎসব নেই। আমের বউলের গন্ধ নেই। সোনালী শিশির ভেজা ধানক্ষেত নেই।

কিন্তু কেন যাচ্ছি ? লেখাপড়া শিখতে ? উচ্চ ডিগ্রি নিতে ? টাকা কামাতে ? না। সব মিথ্যে কথা। আমি আসলে পালিয়ে যাচ্ছি। কার কাছ থেকে পালাচ্ছি ? কার জন্য আমাকে আমার মাতৃভূমি ছাড়তে হচ্ছে, তার নাম কি ? কে সে ?

তার নাম সোনিয়া।

নামটা মনে পড়তেই মগজে বিদ্যুৎ খেলে গেলো। মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়লো সেই বিদ্যুতের তীব্র উষ্ণ ঝলক। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হলো—আই হেট হার। আই হেট সোনিয়া।

নীপা ভাবীকে সোনিয়া কি কি বলেছিলো মনে পড়লো—"আমি ওকে ঘৃণা করি। ওর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। আমি সিমুলকে অন্তর থেকে ঘৃণা করি।"

চোখের পানি এমনিতেই বন্ধ হয়ে গেলো। সোনিয়ার প্রতি ক্রোধ আমাকে উত্তপ্ত করে তুললো। সোনিয়া তুমি একটা অমানুষ। আমাকে জিজ্ঞেস করলেই পারতে। রিনি'পাকেও জিজ্ঞেস করতে পারতে। একটা ভুল বিশ্বাসকে আঁকড়ে আমার জীবনটা এমন এলোমেলো না করে দিলেও পারতে।

আজ ভাবতেও ঘৃণা হচ্ছে। এই সোনিয়াকেই আমি একদিন সুইট হার্ট বলে সম্বোধন করতাম মনে মনে ওকেই "পিচ্চি বউ" সাজাতাম। ওকে নিয়ে কল্পনার পাহাড় রচনা করতাম। সব মিথ্যা — ডাহা মিথ্যা।

হিথরো বন্দর থেকে কানেকটিং ফ্লাইট পেতে দেরি হলো না। মাত্র দু'ঘণ্টা। মনে করেছিলাম, চার ঘণ্টার বেশি অপেক্ষা করতে হবে। হিথরো বিমান বন্দর, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি প্লেন যেখানে ওঠানামা করে। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর যখন প্রথম চালু হলো, তখন বলতাম তেজগাঁ বিমান বন্দরের চেয়ে কত বড়। এখন হিথরো বিমান বন্দর দেখে মনে হচ্ছে, জিয়া বিমান বন্দর কত ছোট।

হিথরো বিমান বন্দর থেকে উড়লাম। পুরনো অনেক যাত্রী নেমে গেছে। নতুন নতুন যাত্রী যোগ হয়েছে। আমার পাশের বয়স্ক ভদ্রলোক নেমে গেছেন। নতুন সহযাত্রী একজন আধ-বয়সী মহিলা, বিদেশিনী। হতে পারে, ইংরেজ মহিলা। কথায় কথায় সরি আর থ্যাংয়্যু শব্দ ব্যবহার করছে। গায়ে চড়িয়েছে মোটা জ্যাকেট। ভদ্রমহিলার গা থেকে বোটকা গন্ধ বের হচ্ছে। এবার আমি বিব্রত বোধ করতে লাগলাম।

ডিনার খেলাম। মন ভরে খেতে পারলাম না। খেতে ইচ্ছা করছে না। দু'বার বাথরুম করলাম। বমি বমি একটা ভাব প্রথম থেকেই অনুভব করছি। প্লেনের জার্ণিতে বোধহয় এমন হয়। জানি না, কারণ এটাই আমার জীবনের প্রথম প্লেন জার্নি।

নিউইয়ার্কের মাটিতে প্লেন নামলো। ক্যাপ্টেনের ঘোষনার পর থেকেই উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। প্লেনটা যখন একটা ঝাঁকি দিয়ে মাটি ছুঁলো তখন মন অজানা ভয়ে কাঁপলো।

আমার পাশপোর্ট পরীক্ষা করলো। সীল করা কাগজপত্র যা এ্যামব্যাসি থেকে প্যাকেট করে দিয়েছিলো সেগুলো খুলে পরোখ করলো। "স্কুল অব কম্পিউটর" এর নামে ডি. ডি দেখলো। ভয় পেলাম, হয়তো অনেক কিছু জিজ্ঞেস করবে। হয়তো ঢুকতেই দেবে না। কিন্তু পরে বুঝলাম, আমেরিকান অফিসারেরা তাদের সব রংবাজী প্রদর্শন করেন শুধু ঢাকা আমেরিকান এ্যামবাসিতেই, এখানে এরা একটা প্রশ্নও করেন না।

দিব্যি গটগট করে এয়ারপোর্ট থেকে ভেতরে ঢুকে গেলাম। এতোক্ষণ তো এয়ারপোর্টের ভেতর ছিলাম ভয়ে ভয়ে। এখন আর ভয় নেই। আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। তারপর কানেকটিং ফ্লাইটে যাবো ফ্লোরিডা। অপেক্ষা করার সময় শীতের প্রকোপ অনুভব করলাম।

হাড় পর্যন্ত জমে যাওয়ার অবস্থা। দাঁতে দাঁত থরথর করে বাড়ি খাচ্ছে। গায়ের কোট টেনেটুনে ধরলাম। মনে হলো, গায়ের কোটটাকে পাতলা গেঞ্জী। শীত মানে না। গ্লাস দিয়ে দেখা যাচ্ছে, দুরের আকাশ থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার ঝড়ছে।

সারা শরীর অবশ হয়ে যাওয়ার যোগাড়। আশেপাশে সবার গায়ে পুল-ওভার নাহয় ওভার কোট।

একজন বিদেশী লোক আমার কাঁপুনি দেখে এগিয়ে এলো। পরামর্শ দিলো—তোমার মোটা কোট ব্যবহার করা উচিত ছিলো। তুমি বোধহয় জানতে না, এখানে এতো শীত, তাই না? একটু পরে প্লেনে উঠে যাবে এবং কিছুক্ষণেই ফ্লোরিডা পৌঁছে যাবে। ওখানে শীত নেই, বসন্তের মতো আরামদায়ক আবহাওয়া। ভালো বুদ্ধি দিলো। ওখানে খুব গরম পাওয়া যাবে। জানা ছিলো না। জানবো কি করে (?) আমি তো আর কখনও ন্যুয়র্ক বা ফ্লোরিডা আসিনি। কিছুক্ষণ পরেই মাইকে ঘোষণা করলো, আমাদের প্লেন এসে গেছে, ফ্লোরিডাগামী যাত্রীরা যেন প্লেনে চড়ে।

এগিয়ে গেলাম। চতুর্পাশে সব ফরেনার, লাল চামড়া। কাকে জিজ্ঞেস করবো, কোনদিকে প্লানটা রাখা? ক'জন মহিলার প্রতি দৃষ্টি পড়লো, এতো শীতেও পা খোলা। বুঝলাম, শীত থেকে বাঁচার চেয়ে পা দেখানোর আগ্রহ এই মেয়েগুলোর বেশি। ওদের পেছন পেছন হাঁটতে লাগলাম। একজন মহিলা আমার টিকিট দেখে নিজেই হেসে বললো, 'আমিও ফ্লোরিডা যাচ্ছি।'

প্লেনে উঠে বসলাম। ফ্লোরিডাতেই "স্কুল অব কম্পিউটর" ওখানে আমি ভর্তি হয়েছি আমার বর্তমান মহিলা সঙ্গী চেনে। প্লেনের ভেতরে ঢোকার পর আমার কাঁপুনিও একটু একটু কমতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে প্লেন টেক অফ করলো। আবারও সেই যন্ত্র দানব, তবে আকারে ছোট, আমাকে নিয়ে ছুটে চললো অন্য স্টেটে—ফ্লোরিডা। এখানে সবকিছু অন্যরকম।

দুই

স্কুল অব কম্পিউটর, ফ্লোরিডাতে পৌঁছালাম। প্রথমে স্কুল অফিসে ঢুকলাম। কর্তৃপক্ষের একজন আমাকে হোস্টেলে পাঠিয়ে দিলো। আমার নাকি বিশ্রামের দরকার। অফিসিয়াল কাজ সব পরের দিন হবে।

হোষ্টেলে গেলাম। আমার নামে একটা সিট বরাদ্দ আগে থাকতেই করা হয়েছে। ঢুকলাম নির্দিষ্ট রুমে। কর্তৃপক্ষের এক জন আমার হাতে ওয়ার্ডরোবের চাবি বুঝিয়ে দিলো।

রুমে ঢুকে দেখি, একই রুমকে কায়দা করে দু'ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি খোপে দুটো করে সিট। মাঝে এক চিলতে জায়গা। ওখানে খাবার টেবিল, টি. ভি, ফ্রিজ চারজনের ব্যবহারের জন্য।

আমাকে আমার রুম-মেটরা সাদরে গ্রহণ করলো। আমার দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য জানিনা, রুম-মেটের তিনজনই মেয়ে। দু'জন সাদা চামড়া। একজন কিছুটা কালো মেশানো চামড়ার। দু'জন সাদা চামড়া এক খোপে আর বাঙ্গালী শ্যাম ধরনের মেয়েটা আমার রুমে। ওর সামান্য কোঁকড়া চুল দেখে বুঝলাম, মেয়েটার বাপ অথবা মা নিশ্চয়ই নিগ্রো। পরিচয় হলো, মেয়েটার নাম লিণ্ডা।

লিণ্ডা আমাকে পেয়ে খুব খুশি হলো। প্রথমেই জড়িয়ে ধরলো। গালে কিস করলো। আমি তো ভয়ে জড়সড়। এ কেমন অভ্যর্থনা! পরে দেখি, পাশের খোপের দু'জন টিটি ও মিলি ওরাও আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো। আমি শুধু মনে মনে বললাম, এ কোথায় এসে পড়লাম?

'তুমি খুব ক্লান্ত। তোমার পরনে গরম কাপড় নেই। তুমি কাঁপছো। এই মুহূর্তে তোমার টেম্পারেচার বাড়ানো দরকার।' বললো লিণ্ডা।

ওরা আমাকে ঘিরে বসেছে। একজন একবোতল স্কচ হুইস্কি আর গ্লাস সামনে রাখলো। টিটি নামের মেয়েটা আমার দিকে এগিয়ে দিলো। যদিও এখানে ন্যুয়র্কের তুলনায় শীত নেই বললেই চলে।

মিলি চারটে গ্লাসে ঢাললো। আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো। 'হ্যাভ চেয়ারস।'

বাঙ্গালীরা জাতে লাজুক। তিন তিনটে মেয়ে এতো আপন করে মদ অফার করছে। রিফিউজ করি কি করে? তাছাড়া আমি জীবনে মদ খাই নি, এমন নয়। এখানে "ক্ষ্যাত" সাজার কোনো দরকার নেই। 'চেয়ারস' গ্লাস ঠোকাঠুকি করলাম। এসব কায়দা ঢাকা থাকতেই শিখেছি।

দু'চার ঢোক দিতেই, গা-টা গরম হয়ে উঠলো।

'তুমি কোথা থেকে আসছো?' লিণ্ডা জিজ্ঞেস করলো।

লিণ্ডাই বেশি আপন হবার চেষ্টা করছে। কারণ আমি ওর খোপেরই বাসিন্দা হয়ে এসেছি।

'আমি বাংলাদেশ থেকে আসছি।'

'সেটা কোন দেশ?'

টিটির প্রশ্নের উত্তর আমায় দিতে হলো না। মিলিই বললো, 'আমি জানি, ওটা ইণ্ডিয়া এরা ইণ্ডিয়ান।'

আমি বললাম, 'ওটা ইণ্ডিয়া না। এককালে ছিলো এখন নতুন স্বাধীন দেশ।'

টিটি এমনভাবে লাফিয়ে উঠলো, যেন বিরাট কিছু আবিস্কার করে ফেলেছে। চিৎকার করে বললো 'দেশটার নাম ঢাকা।'

আমি বুঝিয়ে বললাম, 'ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানীর নাম।'

হতাশ হলো টিটি।

এভাবে আমার পান-পর্ব ও আলাপ-পর্ব চললো বেশ কিছুক্ষণ।

'তুমি অনেক দূর থেকে জার্নি করে এসেছো। নিশ্চয় ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত। তুমি কি এখন কিছু খাবে

আমি বললাম, 'গোসল সেরে খেয়ে ঘুমুলে ভালো হয়। এখন গোসল করলে ফ্রেশ লাগবে।'

'হোয়াট!' এরা তিনজনেই আশ্চর্য হয়ে গেলো।

'তুমি এই ঠাণ্ডার মধ্যে এসময়ে গোসল করবে? নির্ঘাৎ নিমুনিয়া বাধাবে।' টিটি আমার কাছে উঠে এলো। আমার মুখটা নিজের মুখের সাথে টেনে নিয়ে চুমু দিলো। 'না অমন কাজটা করো না। রাতে খেয়ে ঘুমোও, সকালে অনেক বেলায় গোসল করবে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে বাবা।' মাথা নাড়ালাম।

'এই তো গুড গাই।' মিলিও বাদ রইলো না। আমাকে চুমু দিলো।

'তুমি কিছু খেয়ে ঘুম দাও বরং।' লিণ্ডা আমার হাত ধরে টেনে তুললো।

'আমার কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না। এখন ঘুম দরকার। শুধু রাতটুকু ঘুমুলেই ভালো লাগবে।'

'তুমি বরং ক'টা ফ্রুট খাবে এসো।'

আমাকে টেনে নিয়ে দুই খোপের মাঝামাঝি যৌথ-রুমে বসালো। ফ্রিজ খুলে একডালা ফল এনে সামনে রাখলো। ফ্রিজে আরো অনেক কিছু চোখে পড়লো। আশ্চর্য হলাম! ছাত্রদের হোষ্টেলে ফ্রিজ। ফ্রিজে ভর্তি খাবার, ফল। একই রুমের বাসিন্দা মেয়ে। সেই মেয়ের ব্যবহার ঘরের বৌ এর মতো। সবকিছুই তো অন্যরকম। এ কেমন দেশ?

গোটা কতক আঙুর খেলাম। একটা গোটা আপেলে কামড় বসালাম। ওরাও আমার সাথে দু'চারটে খেলো।

খাওয়ার পর টিটি আর মিলি গুড নাইট জানিয়ে পাশের খোপে চলে গেলো। আমার হাত ধরে লিণ্ডা আমাদের খোপে নিয়ে এলো।

'তুমি নাইট ড্রেস পরে নাও।'

এবার পড়লাম বিপদে। নাইট ড্রেস পাবো কোথায়?

মেয়েটা কি বুঝলো জানি না। সে বললো, 'আনতে মনে নেই না?'

'হাঁ।'

'ঠিক আছে।' ওয়ার্ডরোব খুলে লিণ্ডা একটা নাইট কোর্ট বের করলো। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো। 'এটা তো শর্ট হবে তোমার। তবে আমার গায়ের টা বেশ লম্বা। দাঁড়াও এটাই খুলে দিই।'

চমকে গেলাম। আরে আরে মেয়েটা করে কি? দ্রুত গায়ের কোর্ট টা খুলে ফেললো। আমারই সামনে। কোনো লজ্জা নেই, শরম নেই। বের হয়ে পড়লো ওর ব্রা জড়ানো উচুঁ স্তন। তারপর আমার দিকে কোটটা এগিয়ে দিলো, 'নাও এটা পরো।'

ওর বগলের অবস্থা দেখে আমার ঘেন্না লাগলো। কোটটা নিলাম। গায়েও চড়ালাম। বোঁটকা বোঁটকা গন্ধ। কতদিন ধোয়নি কে জানে? নাক সিঁটকে পরলাম। কি করা?

লিণ্ডা আমার মুখের দিকে তাকালো। বোধহয় আমি ওর চোখ ফাঁকি দিতে পারিনি। ওর বুকের দিকে হয়তো খারাপ ভাবে তাকিয়েছি।

ও নিজের কোটটা গায়ে দিলো। আমার কাছে এগিয়ে এলো। আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো। 'কি ইণ্ডিয়ান? আমাকে তোমার কাছে খুব লোভনীয় লাগছে?' আমাকে ওর বুকের সাথে সেঁটে ধরলো। চুমু দিলো।

'না মানে·· কি বলবো? আমতা আমতা করতে লাগলাম। মেয়েটা একেবারে মিথ্যে বলে নি, ওর কথাও তো ঠিক।

'তাহলে কিন্তু খরচ করতে হবে।' লিণ্ডা হাসলো।

বলে কি! মেয়েটা বললো কি? এ তো আমাদের দেশের পাড়ারও অধম। হোষ্টেলের ছাত্রী। অবাধে প্রস্তাব! ছিঃ ছিঃ, ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়। ধীরে ধীরে ওকে ছাড়ালাম। শুধু বললাম, 'মিস লিণ্ডা, আমি খুবই ক্লান্ত। আমার ঘুম দরকার।'

'তা ঠিক।'

আমাকে ছেড়ে দিলো মেয়েটা। আমিও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বাথরুমে গেলাম। কিছুটা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হলাম। বাথরুমে গিয়ে দেখি সেখানে কি নেই? স্নো, ক্রিম, স্যাম্পো, রেজার, ব্লেড, হিটার, সাবান, সেন্ট, লোশন, মেক-আপ, চিরুনী, নকল ভুরু, রিমেল, আই-স্যাডো, আই-লাইনার, মাসকারা আরো কত কি। এতোসবের নাম জানবো কি করে (?) কখনও দেখেছি নাকি?

বাথরুম থেকে বের হলাম। সোজা বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। পাশের টেবিলে বসে লিণ্ডা। বড় লাইটটা অফ করে দিয়েছে। টেবিল লাইট জ্বালিয়ে পড়ছে ও।

আমার বেডে এগিয়ে এলো। আমার গালে একটা কিস করলো, 'গুড নাইট বয়।'

আমিও বললাম, 'গুড নাইট।'

ও চলে গেলো। এতোক্ষণ দেশের কথা ভাবার কোন ফুরসতই পাইনি। এখন ভাববো বলে মনে করলাম। কিন্তু হলো না। এতো ক্লান্ত হয়েছিলাম যে, বিছানায় পড়ার মিনিট দশেকের মধ্যেই হারিয়ে গেলাম অতল ঘুমে।

তিন

সকালে একজন বাংলাদেশী পেলাম। নাম রেজা। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি শুনে রেজা নামের বাঙ্গালী ছাত্রটি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। লিণ্ডা ওকে ঘরে নিয়ে এলো। রেজার কথা শুনে এবং ওকে দেখে প্রথমে বুঝতেই পারিনি, ও বাংলাদেশী। একেবারে খাঁটি আমেরিকান কাউবয় মার্কা পোশাক। অনর্গল আমেরিকান এ্যকসেন্ট ইংরেজি। লিণ্ডা আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো।

'কেমন লাগছে আমেরিকা?'

'আপনি বাঙ্গালী?'

'একেবারে খাঁটি, মাহুত টুলির ছেলে, খাস কুট্টি।'

'এখানে পড়েন বুঝি?'

'নাম কা ওয়াস্তা ছাত্র।'

'মানে?'

'ভাইরে, এখানে থাকতে হলে এবং পয়সা কামাতে হলে অনেক ফন্দি ফিকির করতে হয়। আমি ভাই গরীবের ছেলে, লক্ষ লক্ষ টাকা দেশ থেকে এনে এখানে পড়া সম্ভব নয়। তাই চাকুরি করি আর পড়ি। তিনমাস পড়ি তো ন' মাস চাকুরি করি।

'ভাই রেজা, আমার তো এসব জানা দরকার। নতুন এসেছি।

এদের ইংরেজি একভাগ বুঝি তো তিনভাগই বুঝি না। তাছাড়া এসব কথা এদের কাছে তো জিজ্ঞেস করা যায় না। আপনি যদি আমকে কিছু পরামর্শ দিতেন। তাহলে আমি কৃতজ্ঞ থাকতাম।'

'কিছু মনে করবেন না মিষ্টার সিমুল।' রেজা একটু ইতস্তত করেই বললো, 'আপনি কি দেশে অনেক ধনি। লক্ষ লক্ষ টাকা দেশ থেকে আনতে পারবেন? নাকি ধার হাওলাত করে এসেছেন? এবং দেশে টাকা পাঠাতে হবে?'

'দেশে একজন মধ্যবিত্ত পরিবার আমাদের। অনেক টাকা তো দুরের কথা, চার আনাও আনা সম্ভব নয়। বরং এই ধার করে আনা টাকা শোধ করতে হবে। খুব কষ্টে ঝুঁকি নিয়ে এসেছি।'

'ব্যাস ব্যাস বুঝেছি। আর কিছু বলতে হবে না। এবার আমি যা যা বলি তাই করুন। এমন বুদ্ধি দেবো, যেন আপনার দেশ থেকে আনা টাকাও দেশে ফিরে যায়।'

'বলুন ভাই।' অকুল সাগরে যেন বাঁচার বাণী শুনছি আমি।

'মিস লিণ্ডা, আমি দেশীমানুষ পেয়ে অনেক বকবক করছি। তুমি কি কিছু মনে করছো?'

'না না তা হবে কেন? তাছাড়া আমার কোন অসুবিধাও হচ্ছে না, আমি তো তোমাদের কথার একটা শব্দও বুঝছি না। অপরিচিত ভাষায় কেউ কথা বললে আমার শুনতে ভালো লাগে, হয়তো বুঝি না বলেই।'

'মাই সুইট হানি।' রেজা আনন্দে এগিয়ে গেলো। লিণ্ডাকে কিস করে আবার আগের জা'গায় এসে বসলো।

'যা বলছিলাম, আপনি স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে বলুন, আমি এককালিন এতো টাকা দিতে রাজি নই। মাসে মাসে দেবো, অন্যসব ছাত্ররা যেমন দেয়। দেখবেন ওরা আপনার ডি. ডি. টা ক্যানসেল করে দেবে। আপনি তখন ওটা পোষ্টে ঢাকাতে পাঠিয়ে দেবেন। আপনার বাড়ির লোকেরা ভাঙ্গিয়ে নেবে। আর আপনি হোষ্টেল ছেড়ে মেসে উঠবেন। এখানে বহু বাংলাদেশী ছেলেদের মেস আছে। চাকুরি করবেন আর মেসে ঘুমুবেন। এক সেমিষ্টার পরীক্ষা দেবেন তো তিন সেমিষ্টার গ্যাপ দিবেন। কি ভাবে তা করবেন পরে শিখিয়ে দেবো।'

'আপনার কথা শুনতে খুব মজা লাগছে। এখনই বলুন না ভাই। শুনে রাখি।'

'স্রেফ তিন দিন না খেয়ে থাকবেন। প্রেসার নেবে যাবে। ডাক্তারের কাছে যাবেন। ডাক্তার ভালো খাওয়া ও বিশ্রামের পরামর্শ দেবে। ব্যাস সেই চিকিৎসা-পত্রটা জমা দিলেই স্কুল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা না দেওয়ার পরামর্শ দেবে।'

'তার জন্য না খেয়ে প্রেসার কমাবার দরকার কি? ডাক্তারের কাছ থেকে ফলস্ সার্টিফিকেট নিলেই তো পারি।'

'না। ভাইরে, এদেশে আমাদের দেশের মতো ডাক্তারেরা অতো জালিয়াতি করে না। এখানে ফলস্ সার্টিফিকেট পাওয়া যায় না।'

'কিন্তু মিষ্টার রেজা, হাতে যা আছে তা যদি স্কুলকে নগদ দিয়ে দেবো তাহলে চলবো কি করে? ইনিসিয়াল পেমেন্ট কত দেবো

তাও তো জানি না।'

'টাকা টান পড়লে আমি তো আছি, ও নিয়ে চিন্তা করবেন না।' রেজা আশ্বাস দিলো। সাথে সাথে একথাও বললো। 'পরে যখন টাকা ফেরত দেবেন তখন ব্যাঙ্ক রেটের একটু বেশি, মানে ইন্টারেস্ট দিয়ে দেবেন, তাহলেই চলবে।'

বুঝলাম, এদেশে বিনা লাভে কেউ কোনো কাজ করে না। অবশ্য আমার এরকম ফেভার নেবার কথা ভাবাও উচিত নয়।

'তারপর আপনি একসময় গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করবেন।'

'কেন?'

'ছাত্র হয়ে চাকুরি করা মানা। তাছাড়া সোশাল সিকিউরিটি নম্বর ছাড়া যারা আপনাকে কাজ দেবে। তারা তো খুব ঠকাবে আপনাকে। আপনাকেও তো পালিয়ে লুকিয়ে কাজ করতে হবে। তাই এখানে থাকার স্থায়ী ব্যবস্থা করবেন না?'

'কিন্তু গ্রীন কার্ড কি হবে?'

'হবে ভাই হবে। কিছু পয়সা কন্ট্রাক করে উকিল ধরবেন। সেই সব ঠিক করে দেবে। পাশপোর্ট গায়েব করে দিয়ে কতলোক দশ বছর ধরে কৃষিকাজ দেখাচ্ছে। কতলোক মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে বে-আইনী ভাবে ঢুকেছে দেখাচ্ছে। সে সব অনেক পথ আছে।'

'কিন্তু ভাই রেজা, আমি কি স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এতোকথা বলতো পারবো? আমি তো এদের সব কথা বুঝতেই পারছি না। এতো ফ্লুয়েন্ট এরা।'

'শুনুন, যেখানে যা বুঝবেন না, শুধু বলবেন—বেগ ইউর

পারডান। দেখবেন, ওরাই বোঝাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এরাও জানে, আপনার মাতৃভাষা আদার দ্যান ইংলিশ। অতএব ইংরেজিতে কাঁচা হবেনই। যতটুকু শিখেছেন তাই বেশি। এটাতো বাংলাদেশ নয় ভাই, যে যত ইংরেজি শব্দ বলতে পারবে সে তত শিক্ষিত। ইংরেজি না জানলে এখানে আপনাকে কেউ অশিক্ষিত ভেবে অবজ্ঞা করবে না।'

'কিন্তু আমি কি পারবো স্কুল কর্তৃপক্ষকে পটিয়ে ডি. ডি. ক্যান-সেল করাবার জন্য রাজি করাতে?'

'খুব পারবেন।' হাতের ঘড়ি দেখলো রেজা। 'ঠিক আছে চলুন, আমি না হয় আপনার জন্য কিছুটা সময় ব্যয় করি। হাজার হলেও দেশী মানুষ। দরকার হলে গ্রান্টার হয়ে যাবো। আমার তো ক্রেডিট কার্ড আছে। চলুন।'

আমি তৈরি হতে লাগলাম। রেজা এই ফাঁকে লিণ্ডার সঙ্গে চুমোচুমি করে বিদায় ও ধন্যবাদ জানালো। আমরা বের হয়ে এলাম।

চার

আমি পারিনি, আমার কথা রাখতে পারিনি। মদ না খেয়ে পারি না। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ি। ভোরে চারটের সময় ঘুম থেকে জাগি, সে-কি কষ্ট! তারপর মুখ হাত ধুয়ে গাড়িতে চড়ি। গাড়িতে বসেই নাস্তা সারি। প্রায় একশ' মাইল দূরে আমার প্রথম চাকুরি। দ্বিতীয় টা অবশ্য পঞ্চাশ মাইল।

পাশপোর্ট বিক্রি করে দিয়েছি। ওটা নাকি ঢাকা চলে যাবে। তারপর গলাকাটা ছবি লাগিয়ে অন্যজন আমেরিকা আসবে। আমার তাতে কিছু আসে যায় না। আমার টাকার দরকার, ব্যাস বেচে দিলাম। সেই টাকা দিয়ে পুরনো একটা গাড়ি কিনলাম। এখানে গাড়ি ছাড়া চলা দায়।

তবে গাড়ীর ড্রাইভ লাইসেন্স করা এখানে বড় কঠিন। লাইসেন্সের মধ্যেও গ্রেডিং হয়। সব লাইসেন্স নিয়ে সব রোডে গাড়ি চালানো যায় না। আমি অবশ্য এখনও "এ" গ্রেড লাইসেন্স পাইনি। ড্রাইভিং লাইসেন্স এখানে অনেক কাজে লাগে। আইডেন্টি কার্ডের মতো।

তারপর যা বলছিলাম সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। জীবনে

যা করিনি, করবো বলে ভাবিওনি, আজ তাও করতে হয়। দুপুরের পর থেকে একটা হোটেলে "বয়গিরি" করি। কত মানুষের কত কথা শুনি। শালার নিগ্রোরা এক নম্বরের পাজী। ভুল করলে গ্লাসের পানীয় ছুঁড়ে মারে মুখে। মালিকও কম নয়, লোক ঠকানো ব্যবসা সবদেশেই আছে। আমার এখনও সোশাল সিকিউরিটি নম্বর হয়নি। তাই ব্যাটারা আমাকে কম টাকা বেতন দেয়।

রাতে যখন সমস্ত কাজের শেষ। তখন গালাগালি করি নিজেকেই। মরতে এসেছিলাম এদেশে। দেশে তো আমার কাজ করার বয়সই হয়নি। আর এখানে "—"এর ছাল উঠে যাবার জোগাড়। বাংলায় কথা বলতে পারি না। এদেশের লোকের কোন ব্যাপারে ইন্টারফিয়ার করতে পারি না। এদের কাছে আমাদের এতোটুকু সম্মান নেই। যেখানে একটা লোক সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারে না, সেখানে লোকের কেন আসে ?) বুঝিনা।

একদিন তো এক নিগ্রো শালা, আমার পেটে গোত্তা মারলো। জানতে চাইলো, আমার এদেশে থাকার লিগ্যাল পারমিশন আছে কি না ? বললাম ছাত্র।

'তাহলে ব্যাটা চাকুরি করিস কেন ? ধরিয়ে দেবো ?' বলেই কোমর থেকে রিভলবার টেনে তুললো। বাঁট দিয়ে আমার পেটে মারলো গোত্তা। তারপর পকেটে যা পেলো হাতিয়ে নিলো।

এমন করে নিজের সম্মানে যখন আঘাত লাগে তখন খুব কষ্ট হয়। কান্না পায়। সব দোষ সোনিয়ার। আমাকে বিদেশ বিভূঁয়ে কে নিঃসঙ্গ করে পাঠিয়েছে ? কার জন্য আমি আমার কচি হাড়ে এই অমানুষিক

শ্রম করছি ? আমি কার জন্য আজ এখানে কাঁদছি ? কার জন্য আমার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি ? কে আমার জীবনটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিলো ?

কে সে ?

সে তো সোনিয়া।

এইসব ভাবলে তখন আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারি না। গাড়ি চালিয়ে সোজা চলে আসি নাইট বারে। এখানে আমাদের দেশের মতো রাত দশটার পর মদ বেচা বন্ধ হয় না। বরং জোরেসোরে চালু হয়। এখানে দিনরাত বলে কিছু নেই। আমি তো একদিন আহাম্মক বনে গিয়েছিলাম। একদিন বারে বসে মদ খাচ্ছিলাম। ভাবলাম বার কখন বন্ধ হবে জেনে নিই। সময় বুঝে সামলে খেতে হবে।

বয় তো আমার কথা শুনে আশ্চর্য। এবং সে যা জানালো তাতে আমি তো যারপর নেই আশ্চর্য হলাম। বয় বলে কি। এই বার'র নাকি কোন তালা চাবি নেই ? তার মানে এটা কখনই বন্ধ হয় না। চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা।

বারে এসেও ভুলতে পারি না সোনিয়াকে। পেগ এর পর পেগ মদ খাই। ঝুম মেরে বসে থাকি। কাঁদি। সোনিয়াকে ভাবি। একে একে মনে পড়ে স্মৃতি। একটু একটু করে স্মৃতি কচুপাতার উপর পানি হয়ে দোল খায়। আমি সযত্নে স্মৃতিটুকুকে আগলে রাখি। কচুপাতা থেকে মধুময় স্মৃতিটুকু যেন গড়িয়ে না পড়ে। সোনিয়া তো আমাকে কিছুই দেয় নি। যা দিয়েছে তা হলো,

শুধুমাত্র স্মৃতি। এটুকুই তো এই সুদূরে আমার সম্বল।

সিনেমার পর্দার মতো কত দৃশ্য ভেসে উঠে চোখের সামনে। কি করে পারে ও আমাকে না দেখে থাকতে? আমাকে আঘাত করে কি পেলো?

আমার সোনিয়া ছিলো ভীষণ অভিমানী। কতদিন আমি হাতজোড় করে ওর মান ভাঙ্গিয়েছি। দুচোখ আমার পানিতে ছলছল করে উঠল—সেদিন সোনিয়ার চুলের গোছাটা হাতে তুলে নিয়ে ডেকেছিলাম 'সোনি?'

'ধ্যাৎ, তুমি এখানে থেকে যাও তো।'

"তুমি।" আমার বুকটা সেদিন অবশ হয়ে গিয়েছিলো। খুশিতে আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার চিড়িয়া এতো-দিনে আমাকে "তুমি" সম্বোধন করেছে। সেদিনই ও আমাকে প্রথম "তুমি" বলে ডাকলো। কি খুশিই না হয়েছিলাম। আনন্দে মনটা নেচে উঠেছিলো।

খুশিতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'রাগ করেছো?'

সনি চুপ।

'সনি?'

সাড়া দিলো না।

'সনি, প্লিজ, বলো না তোমার কি হয়েছে?'

'কিছু হয়নি।'

'তাহলে আমার সাথে কথা বলছে না কেন?'

'আমার ইচ্ছা সেটা।'

'ক্যানো ?'

সনি চুপ ছিলো।

'বলো না কেন ?'

'তুমি স্কুল যাওনি কেন ?' সনির কণ্ঠে অভিমান ঝরে পড়েছিলো।

'হঠাৎ একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। তাই আসতে পারিনি।' আমি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। ও না বুঝলে তো আমারই কষ্ট বেশি।

'যদি ওরা আমাকে কিছু বলতো ?'

আমি তো মনে করেছিলাম, সোনিয়া আমাকে ভালোবেসেই কথাটা বলেছিলো। আমি স্কুলে ওকে আনতে যাইনি বলে মনে করেছিল। আজ আমেরিকায় বসে মনে হচ্ছে, ভুল—সব ভুল। সেদিন মেয়েটা নিজের বিপদের কথা ভেবে আমাকে বিপদের মাঝে নিতে চেয়েছিলো। কোনো ভালোবাসা ছিলো না, ছিলো স্বার্থ। শি ইজ এ শেলফিস।

আমি সেদিন ওর এই স্বার্থপরতা বুঝতে পারিনি। বলে ছিলাম, 'ওদের জিভ ছিঁড়ে ফেলতাম।'

'তোমাকে আর যেতে হবে না।'

'সনি প্লিজ রাগ করো না।'

'আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি।'

আজ মনে হচ্ছে, সেদিন এই কথাটা না বললেই ভালো করতাম। কাকে কি বললাম ? সে তো ভালোবাসার যোগ্যই

নয়। প্রকৃত ভালোবাসা নেওয়ার যোগ্যতা সবার থাকে না। সেদিন আমি ভুল বলেছিলাম।

সেদিন সনি বলেছিলো—'আমি পারবো না।'

আমি জিসেজ্ঞ করেছিলাম—'কি পারবে না?'

'তোমাকে ভালবাসতে পারবোনা।'

হাত জোড় করলাম, 'দাও মাফ করে দাও।'

ভুল করেছিলাম। ছিঃ ছিঃ কার কাছে মাফ চেয়েছিলাম? টেবিলে থাপ্পড় লাগালাম। সেদিনই আমার বোঝা উচিত ছিলো। সোনিয়া আমাকে সত্যিকার ভালোবাসে না। ভালোবাসতে পারে না। শি ইজ এ লায়ার। শি ইজ মিন মাইণ্ডেড। শি ইজ সেলফিশ।

কান্না চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। হায়রে প্রেম, তুই এতোটা জ্বালাবি আগে বুঝিনি। নাহলে কে তোকে প্রশ্রয় দিতো? কে কাজীপাড়ার রাস্তার রোদ খেয়ে তোকে পাত্তা দিতো?

সোনিয়া তোমাকে আমি বেশি ভালো বেসেছিলাম। তাইতো আজ বেশি কাঁদছি। তাইতো আজ এতোদূরে, তোমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তুমি থাকো তোমার ভুল বোঝা নিয়ে। তুমি আবার নতুন করে নিজেকে ভাবো। তবে মনে রেখো-সোনিয়া, তুমি সুখ পাবে কিন্তু শান্তি পাবে না। আমার বিষ-নিঃশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে তুমি সমুদ্র তীরের ফুরফুরে বাতাস আশা

করতে পারো না। আমি এখানে বসে যত ফোঁটা চোখের পানি ফেলবো, তোমার বিবেক এক দিন তোমাকে মেপে মেপে ঠিক ততটুকু কাঁদাবে। আমার সত্যিকার ভালোবাসায় তুমি আগুন দিলে সে আগুনে কি আমি একাই পুড়বো? না! না! তোমাকেও জ্বলতে হবে সোনিয়া। তুমিও চিরকাল আমার প্রেমে জ্বলবে জ্বলবে।

একসময় আমি বার থেকে চলতে চলতে বের হয়ে এলাম। রাত তখন গভীর।

পাঁচ

সোনিয়ার মানসিক অবস্থা খারাপ।

সোনিয়া তার রিনিপা'র সাথে কথা বলে না। রিনি' পা বললেও না। ওর সমস্ত রাগ রিনি' পার ওপর। রিনি পা' যদি তখন অমন না করতো, ওকে মিথ্যা না বলতো, তাহলে ও সিমুলকে ভুল বুঝতো না।

প্রেম হারিয়ে গেলেই তার কদর বাড়ে। প্রেম ফুরিয়ে গেলেই তার গভীরতা প্রমাণ হয়। প্রেম দূরে চলে গেলেই স্মৃতিময় হয়ে ওঠে। সিমুল আজ নেই, চলে গেছে অনেক দূরে। হয়তো হারিয়ে গেছে। কিন্তু সোনিয়ার জন্য কি রেখে গেছে? বেদনা আর কান্না মেশানো স্মৃতির পাহাড়। এতবড় দুঃখের পাহাড় সে কাঁধে নিয়ে কি করে বয়ে বেড়াবে? সিমুলের মুখটা যে সদা সর্বদা ওকে কাঁদাচ্ছে।

সোনিয়ার মনে পড়ে সেদিনের কথা, নিপা ভাবীর বাসায়। নিপা ভাবীকে যা যা বলেছিলো, সব সিমুল শুনেছিলো। তাই তো তাকে তার ফুল ফিরিয়ে দিয়েছিলো। সোনিয়া আজ বোঝে, কতবড় আঘাতই না সে তার সিমুলকে করেছিলো।

সিমুল খুব অভিমানী ছেলে। প্রকৃত প্রেমিকেরা যদি একবার অভিমান ভেঙ্গে রাগ করে, তাহলে উপায় নেই। সিমুল কি তাহলে ওর ওপর রাগ করেছে?

সিমুল নিশ্চয় আজ ওকে ঘৃণা করে, অন্তর থেকে ঘৃণা করে।

সিমুল তো তাকে ভুলতেই সুদূরে পালিয়েছে। তাহলে সিমুল কি তার মন থেকে ওকে মুছে ফেলবে?

আজ ক'দিন ধরে সোনিয়া খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। সব সময় নিজের রুমে থাকে। দরজা বন্ধ থাকে। শুধু কাঁদে গভীর রাতে সিমুল বাতাস হয়ে জানালার শার্শিতে টোকা দেয়। চমকে ওঠে সোনিয়া। জানালার দিকে মুখ ঘোরায়। সিমুল সে-দিনের মতো যেন ডাকে। কি হয়েছে জানতে চায়। ওঠে জানালা খোলে সোনিয়া। নেই কেউ নেই। ধু ধু অন্ধকার। বুকের ভেতরটা হু হু করতে থাকে। চোখ ফেটে কান্না উথলে ওঠে। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে সিমুল আমাকে ক্ষমা করে দাও। তোমার এতো ভালোবাসা, সেদিন আমি বুঝিনি।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেদিন সিমুল কার্নিশ বেয়ে নেমেছিলো। এসেছিলো ওর ভুল ভাঙ্গাতে। মিথ্যা অহংকারে সেদিন তাকে অপমান করেছিলো ও। চিৎকার করে লোক ডাকবে বলে হুমকি দিয়েছিলো। একবারও ঘটনাটা তলিয়ে দেখেনি। তাইতো আজ ও গুমরে গুমরে কাঁদছে।

হঠাৎ কি মনে করে উঠে বসলো সোনিয়া। চোখ মুছলো। কাপড় পড়লো। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে নেমে এলো।

লালমাটিয়া। নিপা ভাবীর বাসা।

তরতর করে সিঁড়ি ভাঙ্গলো। কলিং বেল একটানা টিপে ধরে রইলো। আজ ছুটির দিন, নিশ্চয়ই নিপা ভাবীকে বাসায় পাবে।

'এভাবে কেউ কলিং বেল বাজায় নাকি?' বিড়বিড় করতে

করতে দরজা খুললো নিপাভাবী। সোনিয়াকে দেখে চমকে উঠলো। পরক্ষণেই মুখটা তার অন্ধকার হয়ে গেলো, 'ওহ তুমি?'

'ভাবী আমি '

'নতুন করে পরিচয় দেওয়ার কোনো দরকার নেই। আমি তো তোমাকে চিনি এবং খুব ভালো করেই।'

'ভাবী অমন করে কথা বলবেন না প্লিজ।'

'তোমার সঙ্গে আজ তো আর তোয়াজ করে কথা বলার প্রয়োজন নেই। যেদিন ছিলো, সেদিন বলেছিলাম। বিনিময়ে তুমি করেছিলে বেয়াদবি, আমার কথা তো সেদিন রাখনি।'

'ভাবী ভিতরে আসবো?'

'কিছু মনে করো না সোনিয়া। তোমার সঙ্গে খোশ গল্প করার মতো সময় আমার নেই। ঘরে মা মৃত্যুশয্যায়, আমি তার পরিচর্যায় ব্যস্ত। এখন তো সময় দিতে পারবো না। তাছাড়া তোমার বিশেষ কোনো দরকার কি আছে আমার কাছে?'

'সরি, আমি জানতাম না। আমি এসেছিলাম

'হুঁ হুঁ বলো।'

'ওর কোনো খবর পেয়েছেন কি-না জানতে।'

'কার?'

'মানে, সিমুলের।'

'তোমার দরকার?'

'ভাবী···!'

'একটা ইয়ং ফ্রাসট্রেটেড ছেলে আমেরিকার মতো স্বর্গরাজ্যে

গেছে। ওর খবর কি হতে পারে, অনুমান করে নাও। কাঁদছে। বারে বসে মদ গিলছে। মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করছে। রাস্তায় গাড়ি মুচছে। হোটেলে খাবার সার্ভ করছে। সি-শোরে জাঙ্গিয়া পরে রোদ তাপাচ্ছে। ফ্লোর-শো দেখছে। 'এইডস'র ভয়ে দুরুদুরু করছে। তোমার অপমানের কথা স্মরণ করছে। তোমার নামে থুক থুক করছে। মায়ের জন্য যখন মনমরা হয়ে একা বসে হা হুতাশ করছে, তখন তোমাকে দোষারোপ করছে। তুমিই তো ওকে বাপের লাথি খাইয়ে মায়ের আঁচল বঞ্চিত করে বিদেশ পাঠিয়েছো।'

'নীপাভাবী, তুমি এমন করে কথা বলছো কেন? তোমাকে তো আমি অনেক বড় বলেই জানতাম।'

'দরকার নেই বড় জানার। আমি স্বামী পরিত্যক্তা এক মহিলা। গতমাসে আমার স্বামী আমাকে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দিয়েছে। আর এরজন্যও দায়ী তুমি।'

'আমি সোনিয়া যেন আঁতকে উঠলো।

'হ্যাঁ তুমি। এতোদিন যদিও একা একা থাকতাম। আমার স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করেছিলো সত্য, কিন্তু ডিভোর্স করেনি। কিন্তু যখনই সিমুল আমার বাসায় যাতায়াত শুরু করেছে যখন তিনি জানতে পেরেছেন, সিমুল রাতেও এখানে থাকে। মাতাল অবস্থায় আমার সাথে রাত্রি যাপন করে, তখনই তিনি এই কাজটা করলেন।' নীপাভাবী চোখ মুছলেন। 'অবশ্য শিমুল আমার এটুকু উপকার করেই গেছে। অমন লোকের সাথে সংসার করার চেয়ে না করা অনেক ভালো।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো নীপাভাবী।

'ভাবী আমি দোষী, না বুঝে অনেক অন্যায় করেছি। আমাকে ক্ষমা করুন।'

'তুমি ভুল করেছো এবং ক্ষমা যার কাছে চাওয়ার সে এখন অনেক দূরে। মিছেই তুমি আমার কাছে এসে সময় নষ্ট করছো। আমি তোমাকে কোনো সাহায্যই করতে পারবো না।'

হঠাৎ ভেতর থেকে গোঙানীর শব্দ ভেসে এলো।

'আপা আপা।' চিৎকার করলো কেউ ভেতর থেকে।

নিপাভাবী ছুটে ভেতরে চলে গেলো। সোনিয়া দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে রইলো। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর পা পা করে ভেতর দিকে এগিয়ে গেলো সোনিয়া।

'আপা যলদি যান। এই ওষুধগুলো কিইনা আনুন। ডাক্তার সাব কি বললেন? এইগুলি এখনই খাওয়ান লাগবো আপনের আম্মারে।'

নিপাভাবী দরজার ফাঁক দিয়ে মায়ের দিকে তাকালেন। মা তখন যন্ত্রণায় ধড়ফড় করছেন।

কাজের মেয়েটা নিপাভাবীকে টেনে পাশের রুমে আনলো। 'যলদি যান, এগুলো আনুন। নাহলে মা আপনের বাঁচবো না।'

'মা এমনিতেই বাঁচবে না।' গম্ভীর স্বরে কথাটা বলে ধপাস করে বসে পড়লো নীপাভাবী।

'আপনে কইলেন কোন হিসেবে?'

'ওরে হিসেব কি করবো? গহনা বেঁচে সিমুলকে ক'টা টাকা

দিয়েছি যাবার সময়। হাতের চুড়ি বেঁচে ঘর ভাড়া দিয়েছি। অবশিষ্ট যা ছিলো তা দিয়ে ডাক্তার ডেকেছি, পথ্য কিনেছি। এখন সম্বল শুধু গলার একভরি চেইনটা। এটাও যদি বেঁচে ওষুধ আনি, তাহলে মায়ের শেষ কাজ করবো কি দিয়ে? মা-তো এমনিতেই বাঁচবে না। শুনলি না ডাক্তার বলে গেলো, আল্লাহকে ডাকতে।'

সানিয়া শুনছে। সে নিপার পাশে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মতো। একটা মানুষ কত কঠিন হতে পারে, তা জীবনে প্রথম উপলব্ধি করছে। নিপাভাবী যেন অন্য ধাতুর মানুষ। মৃত্যুশয্যায় মা ছটফট করছে। আর নিপাভাবী গলার একভরি চেইনে হাত দিয়ে ওটাকে আগলাচ্ছে, মায়ের শেষ দাফন কাফনের জন্য। আরো আশ্চর্য (!) যে, নিপাভাবী একটুও কাঁদছে না।

সোনিয়া হাত ব্যাগটা খুললো। গুনে দেখলো, বেশ কিছু টাকা ওটাতে আছে। সিমুলের মায়ের দেওয়া সেই টাকা এবং ওর বাপের দেওয়া জমা টাকা। টিফিনের টাকাও জমিয়ে এটাতেই রাখে ও। হাজার দু'য়েক তো হবেই। হাতে নিলো।

'ভাবী!'

'হু।' বহুদূর থেকে যেন সাড়া দিলো নিপাভাবী।

'কিছু না মনে করলে আমার কাছে কিছু টাকা আছে। আমাকে প্রেসক্রিপশনটা দিন। আমি ওষুধগুলো আনার ব্যবস্থা করি।'

সোনিয়ার মুখের দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো নিপাভাবী। যেন আগে কখনও সোনিয়াকে দেখেনি। তারপর

মুখটা ঘুরিয়ে নিলো জানালার দিকে। খুব গম্ভীরস্বরে বললো, 'সোনিয়া তুমি কি এখন যাবে? আমি দরজা লগিয়ে একটু নিশ্চিন্তে মায়ের কাছে গিয়ে বসবো।'

'তার মানে আমার টাকা আপনি নেবেন না? ধারও না?'

'না।'

'আপনি কি আমাকে চলে যেতে বলছেন?'

'হ্যাঁ, এবং তা এই মুহূর্তে।'

'এতো অহংকার এই মুহূর্তে আপনার শোভা পায় না ভাবী। আমি আপনাকে করুণা তো করছি না। ধার দিচ্ছি, পরে দিয়ে দেবেন। আপনার এই বিপদে আমাকে ফেরাবেন না ভাবী।'

'অহংকার।' হাসতে চেষ্টা করলো নিপাভাবী। যদিও তার ঠোঁট চিরে যা বের হলো তাকে ঠিক হাসি বলা যায় না। 'এই অহংকার নিয়েই তো স্বামী পরিত্যক্তা হয়েছি। এই অহংকার নিয়েই তো সিমুলের গালে চড় কষিয়েছিলাম। দরকার হলে

'থামলেন কেন বলুন।'

'তুমি যাও সোনিয়া। প্লিজ ইউ গেট আউট।'

'নিপাভাবী!'

'ইয়েস, ইউ আর গেটিং আউট।'

'কিন্তু···।'

'হট'স মাই প্রোবলেম। আই হ্যাভ টু ফেস ইট।'

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো সোনিয়া। নিপাভাবী দরজা খুলে ওকে বের করে দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে রইলো। সোনিয়া বাধ্য হয়ে বের হয়ে গেলো। নিপাভাবী দড়াম শব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

ছয়

নিপাভাবীর মা দেহত্যাগ করেছেন।

নিপা যেন জানতো। অনড় ভঙ্গিতে বসে রয়েছে সে। ডাক্তার নিপার হাতে মায়ের ডেড-সার্টিফিকেটটা ধরিয়ে দিয়ে গেছে। ওটা ধরেই বসে আছে ও। জানালা খোলা। দরজা খোলা। হু হু করে বাতাস ঢুকছে। নিপার চুল উড়িয়ে যেন উপহাস করছে। পাশের ঘর থেকে কাজের মেয়েটার কান্নার চিৎকার ভেসে আসছে। নিপা মূর্ত্তি বনে বনে থ মেরে বসে।

মায়ের মৃত্যুই তো শেষ নয়। এরপরও কাজ আছে, দাফন কাফন করতে হবে। জানাজা পড়তে হবে, টাকা পয়সার দরকার। সম্বল শুধু এক টুকরো গলার চেইন। যা করার তা করতে হবে ওটা বিক্রি করেই।

ও একা। বড় একা। আজ প্রথম মনে হচ্ছে, নিজেকে নিঃসঙ্গ। এই মুহূর্তে সিমুলের কথাই বেশি মনে পড়ছে। ছেলেটা ভালো। ও থাকলে ওকে এতোসব ভাবতে হতো না। সিমুলের জন্য বুকের ভেতর ব্যথা অনুভব করলো।

মা চলে গেছে। ওকে একা রেখে গেছে। এখন নিজেকে নিয়েও ভাবতে হবে। সে পরের কথা। কিন্তু এখন ও কি করবে? কাকে ডাকবে?

মা মরার আগে বলেছিলো, 'নিপা, মেয়েদের এতো জিদ থাকা ভালো নয়।'

বোধহয় সত্য। না-কি মা না বুঝে মন্তব্যটা করেছিলো? ও তো ইচ্ছা করে সংসার ভাঙ্গেনি। ওর স্বামী, ওকে প্রথম থেকেই সন্দেহ করতো। করতো মারধোর। রাত্রে করতো বিকৃত আব্দার। ঠিকমত সংসারের খরচ যোগাতো না। মদের পিছনে পয়সা ওড়াতো। বাইরের মেয়ে নিয়ে করতো ফুর্তি। মা-তো এসবের কিছুই জানতেন না। মা জানবে কি করে? নিপা তো কখনও কোনো কথা মাকে বলেনি। এতো যন্ত্রণা সহ্য করেও তো ও ঘরে রাখতে চেয়েছিলো সংসারটা। কিন্তু কতদিন? যে সংসারে বিশ্বাস উঠে যায় সে সংসার তো ভাঙ্গবেই।

'আপা এখন কি হবে?' কাজের মেয়েটা নিপার সামনে এসে কান্না জুড়লো।

কথা বলতে ইচ্ছা করছে না ওর। মানুষের জীবনে কখনও কখনও এমনটি হয়। কথা বলতে ইচ্ছা হয় না। তবু বলতে হয়। 'এটা নিয়ে যা। গলির মাথায় স্যাকরার দোকান। আমার কথা বলবি। এটা বিক্রি করে যে ক'টা টাকা হয় নিয়ে আয়। আমি মায়ের কাছে থাকি।'

'আপা আমার বেতনের জমা কিছু টাকা আছে।' কাজের মহিলার চোখে পানি।

এতো দুঃখেও হাসি পেলো নিপার। দুঃখভরা হাসি। 'ওরে ওতে কিছু হবে না। এটাও বেঁচতে হবে। তুই দেরি করিস না, যা।'

কাজের মহিলা চলে গেলো চোখ মুছতে মুছতে।

মরা মায়ের কাছে যেতে ভয় করছে। যে মা তাকে জন্ম দিয়েছে। লালন করেছে। তার মৃত্যুর শেষ খরচটুকুও নেই। এই অযোগ্যতার জন্য নিজেকেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করছে।

ওর কি দোষ? এটা তো সমাজের দোষ। ওর চাকুরিটাও নেই, খুইয়েছে। খোয়াতে বাধ্য হয়েছে। উপায় ছিলো না। বস সরাসরি প্রস্তাব করেছিলো। বসের সাথে কক্সবাজার যেতে হবে। একা হোটেলে থাকতে হবে। তার খো াক হতে হবে। নিপা প্রত্যাখান করেছে। অমন বাপের বয়সী বুড়োর কাছে নিজেকে বিসর্জন দিতে পারেনি। এই তার অপরাধ। তাই তো খারাপ আচরণের অভিযোগ এনে তাকে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে।

বস এই প্রস্তাবের আগেও ক'বার ওকে বিরক্ত করেছে। নিপা সহ্য করেছে, শুধু চাকুরি টেকাবার জন্যই। হয়তোবা নিপা ভেবেছে, বাপ যেমন মেয়েকে আদর করে এটাও বুঝি তেমন। ক'বার নিজের রুমে ডেকে চুমু খেয়েছে ওকে।

একবার ভাবলো, সামনের দরজাটা বন্ধ করে মায়ের লাশের কাছে যাবে। কিন্তু যখনই মনে হয়েছে ওটা মা নয়, মায়ের লাশ। একাকি একটা ঘরে লাশের অবস্থান ভেবে ওর গা ছমছম করে উঠেছে। সামনের দরজা বন্ধ করতে পারেনি। ও ঘরে যেতেও পারে নি। মূর্তির মতো চেয়ারেই বসে রয়েছে।

কিন্তু ও ঘরে যেতেই হলো। টেলিফোনটা একনাগাড়ে বেজে চলেছে। ওটা মায়ের লাশের ঘরেই। ফোন ধরার ইচ্ছা ছিলো

না। কিন্তু ধরতেই হবে। এ মুহূর্তে যদি কোনো শুভাকাঙ্ক্ষি জুটে যায়!

'হ্যালো কে?'

'এটা কি নম্বর?'

'জ্বি।'

'আমি হাসপাতাল থেকে বলছি, আপনার বাসার কাজের মেয়েকে কে বা কারা লালমাটিয়া এফ ব্লকে ছুরি মেরেছে। ছিনতাই করে যা ছিলো সব নিয়ে গেছে। এখন ও মেডিকেল কলেজের ৩নং ওয়ার্ডে ১৫ নং বেডে। ইনজুরি বেশ গভীর। তবে বাঁচবে। আপনি চল্‌দি চলে আসুন। ওর অনুরোধেই ফোন করেছি।'

হাত থেকে ফোনের রিসিভারটা চুপ করে পড়ে গেলো। ঠিক ক্রাডলের ওপরেই পড়লো।

মায়ের ফ্যাকাশে অসাড় লাশ। এক ঝলক বাতাস ঘরে ঢুকলো। দরজার পাল্লাটা আছাড় খেলো দেওয়ালে। বুকের ভেতরটা ধ্বক করে উঠলো। দ্রুত দৌড়ে ড্রইং রুমে চলে এলো নীপা। সোফা সেটে বসলো। আঁকড়ে ধরলো সোফার কভার। এখন কি করবে ও?

চিৎকার করে হেসে উঠলো নীপা। ভাবনা কি? সুন্দরী মেয়েদের আবার চিন্তা কিসের কি? গরুর কাছে বামদিকের ঘাস যেমন ডান দিকেরটাও তেমন। শুধু ঘাড় ঘোরাতে হবে, এই যা। রূপ যৌবন যা এখনও অবশিষ্ট আছে, তা ভালো দামেই বিকাবে।

বুকের ভেতরটা কষ্টে টনটন করছে। দেহ বিক্রি করে পয়সা

কামাবে ও। সেই দেহ বেচা পয়সা দিয়ে মায়ের দাফন করবে। কাফনের কাপড় কিনবে। হায়রে! উপযুক্ত মেয়ে বটে!

কিন্তু করবেটা কি?

কার কাছে যাবে? কাছে ভিক্ষা মাগবে? কে ভিক্ষা দেবে? ভিক্ষার অংক কখনও বড় হয় না। ভিক্ষার টাকাতেই কি মায়ের মৃত আত্মা শান্তি পাবে?

ধার? ও আশা মিছে। যখন থেকে চাকুরি ছিলো না, তখনই বুঝেছে। বেকার লোককে কেউ ধার দেয় না। কেউ তাকে বিশ্বাস করে না। ধার দিলে তো ফেরত পায় না। অনেক সময় ভালো মানুষকেও কেউ ধার দেয় না।

মাথার মধ্যে যতসব চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। জট পাকাচ্ছে। সুরাহা পাচ্ছে না নীপা। ওদিকে কাজের মেয়েটা হাসপাতালে। ছুরি খেয়েছে, ওরই জন্য। ওকে কি করবে? কে ওর খরচ দেবে? পথ্য তো দিতে হবে। ঔষধ দিতে হবে।

চিৎকার করে আল্লাহকে ডাকতে ইচ্ছা করছে। খোদা খোদা করে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু তাতে ফল কি হবে? খোদাতো হাতে তুলে কিছুই দেয় না। নীপা খোদাকেও অতো বেশি ভক্তি করে না। খোদা ধনিদের একচেটিয়া সম্পদ। গরীবের জন্য শুধু পরীক্ষক। ধনিদের জন্য দাতা।

ফোনটা আবারও বাজতে শুরু করেছে। একটানা বেজেই চলেছে। না ধরবে না। হয়তো বা আরো কোনো দুঃসংবাদ। হয়তোবা কাজের বেটিরও মৃত্যু সংবাদ। বাজুক। ওটা বেজে বেজে

নিশ্চয়ই এক সময় থেমে যাবে।

বিপদের সময় একবার খোদাকে ডাকলে কেমন হয়? অন্তর দিয়ে তো কখনও ডাকিনি—ভাবলো নীপা। চোখ বন্ধ করে জানালা পথে আকাশের দিকে তাকিয়ে ডাকতে শুরু করলো। 'হে খোদা, তুমি কি আছো? সন্দেহ হয়। মাটি ফুঁড়ে বীজ থেকে যদি গাছ না জন্ম নিতো। সূর্যের আলো আর বাতাস যদি না থাকতো। মৃত্যুর ওপর যদি মানুষের নিয়ন্ত্রণ থাকতো। তাহলে তোমাকে নেই বলেই ধরে নিতাম। আজ তোমার ওপরই সব ছেড়ে দিলাম। দেখি তুমি কি অন্তর্জামি না ভুয়া?'

'শুনছেন?'

'কে!'

চোখ খুললো নীপা।

সামনে দাঁড়িয়ে এক সুপুরুষ। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। হালকা গোঁফ, পিতল মাজা গায়ের রং। বলিষ্ঠ গড়ন। পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি প্রায় লম্বা ইস্তারি করা স্পষ্ট ভাঁজের শার্ট। বেল্ট জড়ানো আটসাট প্যান্ট। একেবারে ঘরের ভেতর। নীপার সামনে দাঁড়িয়ে।

'ফোন ধরার বোধহয় ভেতরে কেউ নেই।'

নিপার মেজাজটা বিগড়ে গেলো। হবে হয়তো ওপর তলার কোনো ভাড়াটের আত্মীয়। যাচ্ছিলো। খোলা দরজা দেখে উঁকি দিয়েছে। ভেতরে সুন্দরী মেয়ে বসে থাকতে দেখেছে। ব্যাস। আলাপ জমানোর চেষ্টা। পুরুষদের তো ঐ এক স্বভাব। একা মেয়ে মানুষ পেলেই হয়, হয় পটাবে নাহয় জোর করবে।

'ফোনটা আনেকক্ষণ ধরে বাজছে। জরুরীও হতে পারে।'

'অতো বেশি বুঝলে নিজেই গিয়ে জরুরী খবরটা ধরুন না কেন?' খিচলে গেলো মেজাজটা নিপার। হড় হড় করে শক্ত কথাগুলো বলেই ফেললো!

'ঠিক আছে।' লোকটা এগিয়ে গেলো। বেডরুমে ঢোকার মুখে আবারও পিছু ফিরলো। 'অনুমতি নিয়েই ভেতরে ঢুকছি কিন্তু।'

লোকটা ভেতরে ঢুকে ফোন তুললো। কাজের মেয়ের অপারেশনের কথা শুনলো। কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি বললো। ফোনটা নামিয়ে রাখলো। পিছু ঘুরলো। এবার আগুন্তকের মেজাজটা খারাপ হয়ে গেলো। একটা লোক দিব্বি মুখ ঢেকে ফোনের পাশে শুয়ে রয়েছে। লোকটা দিনের বেলা এমন কি গভীর ঘুমে আছন্ন যে ফোনটা পর্যন্ত ধরতে পরছে না। এগিয়ে গেলো, 'এইযে ভাই।' একটানে শুয়ে থাকা লোকটার গায়ের সাদা চাদর তুলে ফেললো।

নিপার মায়ের লাশ। ফ্যাকাশে। মুখ সিটকানো নাকে তুলো গোঁজা হীম শীতল মৃতদেহ।

চমকে উঠলো! মুখটা ঢেকে দিলো লোকটা। বের হয়ে এলো ড্রইং রুমে। 'নিপা।'

'কে?' নিপা উঠে দাঁড়ালো। আশ্চর্য হয়ে গেলো আগুন্তক ওর নাম ধরে ডাকলো, কে? কে এই লোক?

'আপনি...কে?' কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলো নিপা।

'ধরেন, এখানে বিশ হাজার টাকা আছে এটা আপনার।'

'মানে?' নিপা চোখ বড় করে তাকালো আগুন্তকের দিকে। 'আপনি ভুল করছেন। আমি ভীকারি নই।'

'কথাটা আমাকে বলছেন কেন? চিঠিতে জানিয়ে দেবেন।'

'বুঝলাম না।'

'গতকালকে সিমুল আমেরিকা থেকে একহাজার ডলার পাঠিয়েছে মায়ের জন্য পাঁচশ' আপনার পাঁচশ'। আমি ভাঙ্গাতে দেরি করেছি, নাহলে কালকেই পেতে পারতেন।'

'আপনি ··· ?'

'আমি রকিব। সিমুলের বড় ভাই।'

টাকাটা হাতে নিলো নিপা। মুখে ঠেকালো। চুমু খেলো। তারপর হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। 'খোদা তুমি সত্যিই আছো।'

'প্লিজ শান্ত হোন।' নিপার মাথায় নিজের অজান্তেই হাত রাখলো রকিব।

নিপা মাথা তুললো। রকিব হাত টেনে নিলো। 'সরি।'

'না ঠিক আছে।' চোখের পানি মুছলো নিপা।

'আমি হাসপাতাল হয়ে মাকে নিয়ে এখনই আসছি।' রকিব দ্রুত বের হয়ে গেলো। 'আপনি প্লিজ একটু ধৈর্য ধরুন।'

নিপা রকিবের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। রকিবের চলে যাওয়া পিছনটা দেখে ও যেন সিমুলকেই দেখতে পেলো। মনে মনে বললো, 'আই লাভ ইউ সিমুল। আই লাভ ইউ।'

দ্বিতীয় বার সিমুল নামটা উচ্চারণ করেনি। তাই কথাটা কাকে উদ্দেশ্য করে বললো, তা আমি (লেখক) জানি না।

সাত

সিমুলের প্রেম জমে উঠেছে।

সিমুল আর লিণ্ডা। উইক এণ্ডে ওরা একসাথে বেড়ায়, খায়, থাকে। লিণ্ডার চেহারায় অনেকটা বাংলাদেশী ছাপ আছে। ব্যবহারও নিরহংকার। লিন্ডার মাঝেই সিমুল খোঁজে তার সোনিয়াকে।

সিমুল গ্রীনকার্ড পেয়েছে। পাশপোর্ট হারিয়েছে ইচ্ছা করে। ওটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তারপর উকিল ধরেছে। উকিল একহাজার ডলারের বিনিময়ে সব কাগজপত্র জোগাড় করে দিয়েছে। সিমুল নাকি ১৯৮১ সালে মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকাতে ঢুকেছে। এবং ফ্লোরিডার এক গ্রামে কৃষি কাজ করেছে দীর্ঘদিন।

অর্থাৎ ও আমেরিকায় দীর্ঘ এগার বছর ধরে অবস্থান করছে। যদিও সব শুধু মিথ্যা।

মিথ্যা নিয়েই কোর্টে উঠেছে সিমুল। উকিল সাহস যুগিয়েছে। তবুও সিমুলের সে-কি নর্ভাসনেস। ইংরেজি একভাগ বোঝে তো তিনভাগ বুঝতে পারে না। ওরা আমেরিকান একসেকেণ্ডে ফ্লুয়েন্ট কথা বলে, বুঝবে কি করে? তবে উকিল শিখিয়ে দিয়েছিলো যতক্ষণ বুঝতে না পারে, ততক্ষণ যেন, "আই বেগ হউর পারডান বলে।" না বুঝে যেন হা অথবা না কিছু না বলে।

চালিয়ে নিয়েছে সিমুল। কাঠগড়ার মতো উঁচুতে দাঁড়িয়ে বার বার মনে পড়েছে রকিব ভাইয়ের কথা। উনি ইংরেজিতে আর্টিকেল লেখেন। চাপাবাজও। এখানে দাঁড়ানো তার জন্যই উপযুক্ত। সিমুল ছাই ওসব পারে না। কিন্তু কথায় আছে—ঠেলায় পড়লে বেড়ালও গাছে ওঠে। তাই সিমুল ঠাণ্ডাঘরেও ঘাম মুছেছে আর জবাব দিয়েছে।

সিমুলের খুব ইচ্ছা ছিলো, পড়াশুনা করবে। কিন্তু সম্ভব নয়। খরচ জোগাবে কি করে? এখানে চাকুরি না করলে চলা সম্ভব নয়। তাই ও চাকুরি করে। দু'হটো চাকুরি করতে হয় ওকে। একটা চাকুরি করে নিজে চলে, অন্যটা জমায়। টাকা কিছু জমেছেও।

সকাল ছ'টার সময় ওঠে। ও গাড়ি চালিয়ে দোকানে যায়। এখানে প্রত্যেকেরই গাড়ি আছে। আমাদের দেশের সাইকেলের মতো, সবার ঘরে। এখানে একটা দোকানের সেলস্‌ম্যান ও। বিরাট ডিপার্টমেন্টাল দোকান। ও এক অংশে কাজ করে। তিনটে পর্যন্ত ওকে দাঁড়িয়ে সার্ভিস দিতে হয়। তারপর এক ডলার দিয়ে একটা স্যাণ্ডুইচ কেনে। গাড়িতে বসেই একহাতে খায়। সোয়া তিনটের মধে অন্য চাকুরিতে যায়। সেখানে রাত এগারটা পর্যন্ত মাল বিক্রি করে। এখানেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ। এগারটা থেকে বারোটা পর্যন্ত পি. সি. (প্যারসোনাল কম্পিউটার) তে পেপার ওয়ার্ক করে। সেটাও দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ সকাল ছ'টার পর থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত গাড়িতে বসা ছাড়া ওকে দাঁড়িয়ে কাটাতে হয়।

তারপর বাসায় ফেরে। বাসায় ফেরার পথে বাজার করে।

ইণ্ডিয়ান মসলার দোকান বেশ দূর। সামান্য কিছু ওখানে পাওয়া যায়। যেতে হয়। বাসায় ফিরে রান্না করতে হয়। চোখদুটো ক্লান্তিতে বুজে আসে। খেয়ে বিছানায় পড়ে সটান। আবার সকাল ছটায় ওঠে। তারমানে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা ঘুমতে পারে ও।

কান্না পায় ওর। হায়রে আমেরিকা! এতো কষ্ট করে পয়সা কামাতে হয়? ওর আয়ে হোটেলে চাইনিজ খাওয়া, বার'এ বসে মদ খাওয়া, মেয়ে নিয়ে রা কাটানো, ঘরে বসে বিশ্রাম নেওয়া কিছুই সম্ভব নয়। অথচ ঢাকা থাকতে, কথায় কথায় চাইনিজ খেয়েছে। এখানে এক প্লেট চাইনিজ রাইস নয় দশ ডলার।

একটা চাকুরির বেতন সপ্তাহে চার পাঁচ'শ ডলার। অর্থাৎ মাসে সাড়ে পনেরশ'। ওর একরুমের ভাড়া চারশ' ডলার। মেস করে থাকলে কম খরচ পড়ে। কিন্তু সিমুল একা থাকতেই ভালো বাসে। ভীড় ওর সহ্য হয় না।

এখন সিমুলের মনে হচ্ছে, বাংলাদেশে যদি কেউ মাসে দশ পনের হাজার টাকা আয় করতে পারে তার এখানে আসা বোকামী। দেশে যাদের কিছুই করার নেই যারা গরুর মতো খাটতে পারে, আমেরিকা শুধু তাদের জন্যই। কারণ (অড জব) নিম্নশ্রেণীর চাকুরির অভাব এখানে নেই।

বাংলাদেশে থাকতে ওর মনে হতো, আমেরিকা যেন কি? কত সুখ। কত শান্তি। এখন বুঝছে, এখানে কত কষ্ট। খাটতে খাটতে শেষ হতে হয়। দু'দণ্ড কেউ ওর সাথে আড্ডা দেয় না।

'ইটস ইউর কল।'

'ইটস মি ?' সিমুল ফোনের দিকে এগিয়ে গেলো। রিসিভার কানে চেপে ধরলো, 'দিস ইজ সিমুল।'

অপর প্রান্তে লিণ্ডা। ইংরেজিতেই কথা বলছে। 'হানি, আর কতক্ষণ তোমার ডিউটি ?'

ঘড়ি দেখলো সিমুল, রাত এগারটা। উত্তর দিলো, 'বারোটা পর্যন্ত, পেপার ওয়ার্ক শেষ করতে হবে তো। আজ তো সপ্তাহের শেষ দিন। তাই কাজ আছে প্রচুর।'

'তারপর তোমার কি কাজ ? হোল নাইট তো চাকুরি করছো না ?'

'আগে সারারাতই চাকুরি করতাম। কিন্তু দিনে খুব কষ্ট হতো। তাই ছেড়ে দিয়েছি

'কিন্তু রাতে চাকুরি করলে তো বেশি পারিশ্রমিক পেতে।'

'অতো পয়সার দরকার নেই।'

'তাহলে বারোটার পর ফ্রি।'

'শপিং আছে '

'সে দুজনে একসাথে করা যাবে।'

'তোমার মতলবটা কি মিস ?'

'তেমন কিছু নয়, নাইট শো এনজয় করবো। তুমি বাজার করে গাড়িতে ঢুকিয়ে নিতে পারবে।'

'হানি, নাইট শো তো খুব এক্সপেনসিভ। আমার পক্ষে বেয়ার করা তো কষ্টকর।'

'হিজ হিজ হুজ হুজ। ও. কে ?'

নাইট শো। বিশ্রী ব্যাপার স্যাপার, তার ওপর পাশে একটা মেয়ে থাকবে। সামনে মদের গ্লাস। রিনিঝিনি বাজনা। হালকা আলো মানবমানবীর আদিম নৃত্য এবং সবশেষে অন্যকিছু। লোভ সংবরণ করা কঠিন। তাই সিমুল রাজি হলো বললো, 'ও. কে.।'

'আমি তাহলে তোমার কর্মস্থানে চলে আসি। গাড়ী সঙ্গে আনবো না। পাবলিক কেরিয়ারে আসবো, একটু দেরি হতে পারে। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে।'

'গাড়ী আনবে না কেন হানি ?'

'নাইট ক্লাবে কার পার্কিং করা খুব এক্সপেনসিভ। একটার ফেয়ারই নাহয় দুজন ভাগাভাগি করে শেয়ার করবো।'

'ঠিক আছে। একটু তাড়াতাড়ি আসতে চেষ্টা করো।'

অপর প্রান্তে হাসির শব্দ। 'সারা রাত তো পড়ে আছে। কাল তো একবেলা তুমি কাজ করো না। ডবল পয়সার লোভ যখন ছাড়তে পেরেছো, তখন উইক এণ্ডের রাত তো এনজয় করতেই হবে।'

মেয়েটা রেখে দিলো। সিমুল ছুটির দিন একবেলা কাজ করে না। শরীরকে বিশ্রাম দেয় অবশ্য সব বাঙ্গালীরা এই দিন বেশি করে কাজ করে। ছুটির দিন কাজ করলে পারিশ্রমিক ডবল।

ফোনটা রেখে কাজে মন দিলো। পেপার ওয়ার্ক। কম্পিউটারে ইনপুট দিচ্ছে। প্রিন্ট নিচ্ছে। ক্যাশের সঙ্গে মেলাচ্ছে। সব ঠিক-ঠাক আছে কিনা পরীক্ষা করছে।

সময় সচেতন জাতি এরা, সঠিক সময় জ্ঞান এদের দারুণ। ঠিক

সময়ে লিণ্ডা এসে পৌঁছুলো। সিমুল বের হলো। কিস করলো ওকে। ও-ও।

মার্কেটে গেলো। গাড়ী পার্ক করা খুব অসুবিধা। মার্কেট বোঝায় লোক। বেশির ভাগ লোকই এ সময় বাজারে আসে। রাত বারোটায় যাদের ছুটি, তারা সবাই এসময় বাজারে আসে। ইচ্ছা ছিলো একটু ঘুরে ইণ্ডিয়ান দোকানে যাবে। লিণ্ডা না এলে হয়তো যেতো, কারণ আজ একটু বেশি রাত করে বাসায় ফিরলেও ক্লান্তি লাগে না। কাল ছুটি। ক'পাক ঘুরপাক খাওয়ার পর একচিলতে জায়গা পেলো ও। এখানে গাড়ী থামিয়ে পার্কিং প্লেস খোঁজার সুযোগ নেই। পিছনে অনেক গাড়ী জ্যাম লেগে যাবে। পুলিশ ধরবে, জরিমানা হবে। পার্কিং জায়গা পেতেই গাড়ী ঢুকিয়ে দিলো।

ফ্রজেন মাংস, মাছ কিনলো ও। এখানে কাঁচা কিছু পাওয়া কঠিন। বেশির ভাগই ফ্রোজেন, খেতে ভালো লাগে না। কেমন স্বাদহীন মনে হয়। কিন্তু উপায় নেই। একটা দোকানে দাঁড়িয়ে দু'জন দু'টো বিয়ার খেলো। গা'টা একটু গরম হলো।

'চলো দেরি হয়ে যাচ্ছে।' তাড়া দিলো লিণ্ডা।

'ফ্লোর-শো দেখার জন্য খুব উতলা মনে হচ্ছে।' ইয়ার্কি করলো সিমুল।

'খুব মিথ্যা নয় কথাটা।' হাসলো লিণ্ডা।

দু'জনে গেলাম। এখানেও গাড়ী পার্কিং সমস্যা। যাহোক, জায়গা পেলাম। গাড়ীতে ভালোভাবে তালা দিলাম। এখানে

গাড়ী চুরি খুব সাধারণ ঘটনা। গাড়ী যদি চুরি না-ও হয় ভিতরে কোন কিছু পাওয়া যাবে না। যদিও ঘটনাটা কদাচিৎ ঘটে। শুনেছি, নিওয়্যুর্কে গাড়ী চুরি বেশি হয়।

শোতে ঢুকলাম। মুখোমুখি না বসে পাশাপাশি বসলাম। পাশাপাশি বসলে সুবিধা অনেক। উত্তেজক দৃশ্য দেখার সময় একটু ফষ্টিনষ্টি করা যায়। অনেকে অবশ্য অনেক বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলে।

অনেক পয়সা খরচ করে লোকে এখানে একটু আমোদ প্রমোদ করতেই তো আসে। সবার সাথেই বিপরিত লিঙ্গের এক-একজন। কারো কারো সাথে ভাড়াটে মেয়ে। ওদের ঢলাঢলিই বেশি। কারণ ওরা তাদের কাষ্টমারদের সন্তুষ্ট করতেই এখানে এসেছে।

ডায়াসে একটা মেয়ে নাচছে। কি বিশ্রী পোশাক। গান গায়ছে মেয়েটা। তালে তালে দেহ দোলাচ্ছে। সিমুলের ওসব দেখতে মন চায়ছে না. মেয়েদের উলঙ্গ দেহ অনেক দেখেছে। শখ মিটে গেছে। এখন মনে হয়, মেয়েদের প্রতি ভক্তি না থাকলে, মেয়েদের দেহ ভালো লাগে না। মাথা হেঁট করে গ্লাসে চুমুক দিলো ও। হালকা নীল আলোয় লুকোচুরি খেলছে সারা হলঘর। চোখে লাল রং ধরেছে, নেশা নেশা লাগছে।

'কি শো দেখছো না?' খোঁচা দিলো লিণ্ডা।

আমি লিণ্ডার দিকে তাকিয়ে চোখ ঘষে নিলাম। 'আমি তোমাকে দেখছি।'

লিণ্ডা আমার মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে রইলো। হাতটা বাড়িয়ে দিলো। আমার হাত চেপে ধরলো। 'সত্যই তুমি আমার ফার্ষ্ট ফ্রেণ্ড।'

'তুমি আমার সোনি।' কথাটা বাংলায় বললাম। কিছুই বুঝলো না মেয়েটা। মুখটা শুধু বাড়িয়ে দিলো। আমি ওর গালে চুমু খেলাম। ওর হাত ধরে তুলে ফেললাম। ওর পিঠের নীচে হাত রাখলাম। অন্যহাত অন্যহাতে চেপে ধরলাম। মেয়েটার জিন্সের প্যান্ট আমার পায়ের সাথে লেপ্টে আছে। আমি লিণ্ডাকে ধরে নাচতে লাগলাম উত্তেজক দৃশ্যের তালে তালে ঘনিষ্ট সেই নাচ।

লিণ্ডার মুখটা যেন অবিকল সোনিয়ার মুখ। সেই চোখ, সেই নাক, সেই মুখের গড়ন। দু'চোখ কান্নায় ভরে গেলো এটুকু কান্নার সবটুকুই আমার "পিচ্চি বউ" এর জন্য। যে আমাকে এ পৃথিবীর সবচে' বেশি ঘৃণা করে। আজ এতোদূরে পালিয়ে এসেও পালাতে পারিনি আমার প্রেমের কাছ থেকে। ভুলতে পারিনি ওকে। আজও দেখতে পাচ্ছি ওর চোখে জমানো ঘৃণা, সে-কি তীব্র ঘৃণা। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হলো—আজো তোমায় আমি ভুলিনি,

আট

'সারাদিন কোথায় ছিলেন ?'

প্রশ্নটা শুনলো নিপা। একটু চেয়ে রইলো রকিবের দিকে। স্থানটা হচ্ছে, রকিবদের ড্রইংরুম। নিপার মা মারা যাওয়ার দিন রকিব মাকে নিয়ে গিয়েছিলো। মা-ই ওকে লালমাটিয়া থেকে নিজের ঘরে নিয়ে এসেছেন। এক্ষেত্রে পাঠক পাঠিকা নিশ্চয় সুইট হার্ট —১ থেকেই জানতে পেরেছেন যে, সিমুলেরা দুই ভাই। ওদের কোন বোন নেই অর্থাৎ মা মেয়ে জন্মদানে ব্যর্থ। তাঁর এই ব্যার্থতার তীব্র দহন তিনি চিরকালই অনুভব করেছেন। এবং একই কারণে মেয়েদের প্রতি তার বিশেষ দুর্বলতাও রয়েছে। নিপাকে পেয়ে তাই তিনি মেয়ের মতো বুকে টেনে নিয়েছেন।

সিমুলের বাবার প্রত্যেক বাবার মতো মেয়ের প্রতি দুর্বলতা থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক। তাই তিনিও এব্যাপারে স্ত্রীকে মানা করেন নি। বরং উৎসাহ যুগিয়েছেন। তাছাড়া সিমুলের ব্যাপারে এবং তাকে নষ্ট হতে না দেওয়ার জন্য তিনিও নিপার প্রতি কৃতজ্ঞ।

সিমুলের বাবা বেশি খুশি অন্য কারণে। ভেবেছিলেন, ছেলে তার টাকা চুরি করে উড়িয়ে ফেলবে। কিন্তু যখন জানলেন, শিমুল আমেরিকা গেছে, তখন খুশী হলেন। সিমুল তার টাকা ফিরিয়ে

দিয়েছে। ইউনিভার্সিটির নামে ডি. ডি ক্যানসেল করে রকিবের নামে পোষ্টে পাঠিয়ে দিয়েছে। ওটা খুব সহজে এনক্যাশ করা গেছে। টাকা ফেরত পেয়ে বাড়ির সকলে খুব খুশি।

সবটুকু খুশি গিয়ে পড়লো নিপার ওপর। নিপা যেন নিজের হাতে বকে যাওয়া ছেলেটাকে বিদেশ পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই এবাড়ির মুরুব্বিরা জোর করেই নিপাকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছেন।

'সারাদিন কোথায় ছিলেন?' অনেকক্ষণ নিপা রকিবের দিকে তাকিয়ে আছে। জবাব দিচ্ছে না। তাই দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা করলো রকিব।

মাথা নামিয়ে নিলো নিপা। পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁটতে লাগলো। 'চাকুরির চেষ্টা করছিলাম।'

'চাকুরির চেষ্টা না করলেই কি নয়?' কথাটা বলে রকিব ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টালো। হঠাৎ করে ব্যস্ত হওয়ার ভান করলো।

'আপনার টাকাটা তো শোধ করতে হবে। ও টাকা সিমুল পাঠায় নি। আপনি সেদিন মিথ্যা বলে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। এখন কি করে যে শোধ করি আপনার টাকাটা...'

'টাকা আপনার কাছে তো চাইনি।'

'না চাইলেও তো শোধ করতে হবে। আপনার কাছে ঋণি হয়ে থাকতে খারাপ লাগে তো।'

'ওহ!' রকিব চোখ তুলে বারেকের জন্য নিপাকে দেখেনিলো। মাথাটা নুইয়ে হাতের ম্যাগাজিনটা পড়তে শুরু করলো।

নিপা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। আশা করছিল রকিব হয়তো

কিছু বলবে। কিন্তু না—রকিব পড়াতে মন দিলো। নিপা এক সময় ধৈর্য হারালো। 'কি কিছু বললেন না যে।'

'বলবো ?'

'হুঁ।'

'রোদে রং পুড়িয়ে ঋণ না শোধ করলেও চলবে। ওটা আমার জমানো টাকা। তবে সবটা নয়। অর্ধেক। মা-বাবা এর কিছুই জানে না।' রকিবের মুখ ফসকে "অর্ধেক" শব্দটা বের হয়ে গেলো।

'অর্ধেক। বাকি অর্ধেক কে দিলো ?'

'না মানে মানে' আমতা আমতা করতে লাগলো রকিব।

'বলুন। কে আমাকে দান করেছে ?'

'দান কেউ করেনি, ধার দিয়েছে।'

'কে ?'

'বলতে মানা করেছে। তাছাড়া এমাসে বোনাস পাবো। সপ্তাহিক MORNIG থেকেও বাড়তি কিছু পাবো, তখন শোধ করে দেবো।'

'তবুও আমাকে জানতে হবে ; আমার শুভকাঙ্খি কে ? কে আমাকে গোপনে সাহায্য করেছে ?' নিপা ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

'না শোনাই ভালো, নাহলে আমার ওয়াদা ভঙ্গ হয়।'

'হোক।' চুপা এগিয়ে এলো নিপা। 'বলুন। আপনাকে বলতেই হবে। আমার মাথার দিব্বি।'

'আপনিও তো কম জেদি নয়।'

'বলুন প্লিজ। আমি সবার কাছে ছোট হয়ে থাকতে পারি না।'

'সোনিয়া।'

'কে!' আৎকে উঠলো নিপা।

'সোনিয়া।'

'সোনিয়া গোপনে আমাকে দশ হাজার টাকা সাহায্য করেছে?' বিড়বিড় করতে লাগলো নিপা। 'সোনিয়া, ছিঃ ছিঃ যাকে আমি অপমান করে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।'

'সোনিয়া খুব ভালো মেয়ে। সিমুল অবশ্য ওকে ভুল বুঝেছে। কিন্তু আমি জানি, মেয়েটা ভালো।' কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভঙ্গিতে বললো রকিব। 'ও-ই তো আমাকে এসে খবর দিলো। আপনার মায়ের ভীষণ অসুস্থতার কাছ থেকে খবর পেয়েই না আমি টাকা নিয়ে ছুটলাম।

'না এ হতে পারে না। যে মেয়েটা সিমুলকে করেছে অপমান। যার জন্য সিমুল মায়ের কাছ থেকে দূরে। যে সর্বনাশীর জন্য সিমুল কাঁদতে কাঁদতে দেশ ছেড়েছে। তার কাছে আমি ঋণি থাকতে পারি না। আপনি কেন তার কাছে আমাকে ছোট করলেন?' ফুঁসে উঠলো নিপা।

'আপনি ভুল করছেন। সিমুলের প্রতি সোনিয়া কোন অন্যায় করতে পারে, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'আপনি এতটুকু জানেন মিস্টার রকিব? কিছুই জানেন না। শি ইজ হার্টলেস ওয়ান। ওর হৃদয় বলে কিছু নেই।'

'হয়তো।' রকিব তর্কে যেতে চায় না। তবে সে সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারলো না। কিন্তু নিপার কথার প্রতিবাদও করলো না। প্রতিবাদ করা রকিবের স্বভাব নয়।

'আমি ওর টাকা এই মুহূর্তে ফিরিয়ে দিতে পারলে খুশি হতাম। শি ইজ সেলফিশ ওয়ান। আই হেট হার '

'আপনি একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।'

হোয়াট ··' বাঘিনির মতো ফুঁসে উঠলো নিপা।

'না না ঠিক আছে।' মাথা নামিয়ে নিলো রকিব।

'ওটা তো একটা ছাগল। ওর সঙ্গে রাগারাগি করছিস কেন মা?' বাবা ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকেই নিপার মারমুখী রূপ আর হম্বিতম্বি দেখলেন। 'কিছু বলেছে বুঝি মা?'

'বাবা, আপনার কাছে দশ হাজার টাকা আমাকে ধার দেওয়ার মতো হবে?' নিপা তখন পর্যন্ত রাগে টগবগ। জোরে জোরে শ্বাস ছাড়ছে। ওর আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে। একটা পুচকে মেয়ে ওকে করুণা করেছে। অসহ্য

'হবে, যখন দরকার তখন চেয়ে নিবি। বাবা রকিবকে ভুল বুঝলেন। রকিব যে নিপার মা মারা যাওয়ার সময় কিছু টাকা দিয়েছিলো তা তিনি জানতেন। রকিবের মা-ই সেকথা তাকে বলেছিলেন। ভাবলেন, এখন হয়তো রকিব মেয়েটাকে তাগাদা করছে। কটমট করে রকিবের দিকে তাকালেন।

'এখনই দরকার, এইমুহূর্তে।'

রকিবের বাবা গটমট করে এগিয়ে এলেন ছেলের সামনে। তাকালেন। বললেন, 'ননসেন্স। এখনই তোমার টাকার দরকার হয়ে গেছে না? ব্লাড়ি ফুল, কতটাকা খরচ করেছিস তখন? হিসাব দে, আমি পাই পাই মিটিয়ে দেবো। অসহায় মেয়েটাকে তাগাদা

করতে বিবেগে বাধলো না ?' বাবা যেমন গটমট করে এসে সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক তেমন করেই দুপাদাপ করে চলে গেলেন। যাবার সময় নিপাকে ডাকলেন, 'এসো মা, তোমার টাকা নিয়ে যাও।'

নিপা বাপ ব্যাটার দিকে চাখাচোখি করতে লাগলো। কি করবে, কি বলবে ঠিক করতে পারলো না। বাপের চলে যাওয়া চেয়ে চেয়ে দেখলো রকিব। বাপের ডাকে দু'পা গিয়েও পিছন ফিরে এলো নিপা। রকিবের কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললো, 'আমি দুঃখীত, আমার জন্য অহেতুক আব্বা আপনাকে ভুল বুঝলেন।'

রকিব কিছু বললো না। চুপ রইলো।

নিপা সিমুলের আব্বার পিছন পিছন তার বেডরুমে গেলো। যে একটু দেরি হয়েছিলো। ভদ্রলোক একশ' টাকার একটা বাণ্ডিল আলমারি থেকে বের করে দরজায় দাঁড়িয়ে। নিপা কোন কথা বললো না। শুধু হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিলো।

'যখন যা দরকার হবে নিজের আব্বা মনে করে চেয়ে নিবি। আজ চেয়েছিস খুব খুশি হয়েছি। রোজ রোজ চাকুরি খুঁজতে বের হাস, মনে করিস আমি কিছু বুঝি না, সব বুঝি। শুধু বুঝিনা, বাপের টাকা মেয়ের খরচ কতে বাধে কিসে ? তোর চিন্তা তো আমার, তোর নয়। মা-রে, বুড়ো বাপটা ভুল করে সিমুলকে হারিয়েছে। আর তুইও যদি চাকুরি নিয়ে চলে যাস। ভয় লাগে রে মা।' বৃদ্ধের দু'চোখ পানিতে ভরে গেলো।

গম্ভীর বৃদ্ধ বাপটার মনের ভেতর সিমুর জন্য এতো দুর্বলতা !

আগে জানতো না নিপা। তাছাড়া নিপাকেও তিনি এতো আপন ভাবে নেয়েছেন, তাও বোধকরি আজকের মতো করে এই ক'দিন নিপা বোঝেনি। এই ক'দিনে বৃদ্ধ নিপার সঙ্গে খুব বেশি কথা বলেনি। নিপার সঙ্কোচ হচ্ছিলো, ভদ্রলোক তাকে কিভাবে নিয়েছেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলনা। আজ বুঝলো, ভদ্রলোক তাকে কত আপন করে নিয়েছেন। নিপা নিচু হয়ে সালাম করে বের হয়ে গেলো।

টাকাটা নিয়ে সোজা নেমে এলো। নিপা সোনিয়াদের বাড়ী আগে থেকেতেই চিনতো। কারো সাথে কোন কথা না বলে সোনিয়াদের গেটে নিয়ে ঢুকলো।

ঢুকতেই রিনির সঙ্গে দেখা হলো। রিনি বোধহয় ওর পরিচয় জানে না। হয়তো দেখে থাকবে কিন্তু চেনে না। 'আপনি...।'

'আমি সোনিয়ার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'সোনিয়া...'রিনি যেন কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলো।

'সোনিয়া কি বাসায় নেই?'

'আছে কিন্তু'

'আমি নিপা, নিপাভাবী। সোনিয়ার সঙ্গে খুব দরকার। ওর সঙ্গে দেখা করতে কি আপত্তি আছে?'

'না তা কেন?' রিনি ভদ্রতা করে হাসলো। 'কিন্তু আপনাকে যে একটু কষ্ট করতে হবে। সোনিয়া বোধহয় হেঁটে এ পর্যন্ত আসতে পারবে না। সকাল থেকে দু'বার জ্ঞান হারিয়েছে। খুব দুর্বল। আপনাকে ওর ঘরে যেতে হবে।'

'কি হয়েছে ওর ?'

'জানি না।' রিনির কণ্ঠে যেন একটু উষ্মা। 'তিন ধরে কিছু না খেলে এমন তো হবেই।'

'খাচ্ছে না কিছু, কেন ?'

'আপনি প্লিজ আসুন। আমি ওর ঘরটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি যাবো না, ও আমাকে একদম সহ্য করতে পারে না। ডাক্তারও ওকে ওর মত থাকতে দিতে বলেছেন। আপনাকে যদি ও সহ্য করতে না পারে, তাহলে প্লিজ চলে আসবেন, কেমন ?'

'ঠিক আছে। নিপা ভাবী রিনির পিছন পিছন এগিয়ে গেলো। রিনি আঙুল দিয়ে ইশারায় সোনিয়ার ঘরের দরজাটা দেখিয়ে দিলো। রিনি ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়লো। এবং ইশারায় নিপাকে ভেতরে যেতে বললো।

নিপাভাবী সোনিয়ার ঘরে ঢুকলো। ঘরের ভেতর হাসপাতাল হাসপাতাল গন্ধ। সোনিয়া বিছানায় শুয়ে, ওর মাথার কাছে স্যালাইনের ব্যাগ ঝুলছে। বিছানায় সাথে লেপ্টে রয়েছে সোনিয়া, একেবারে লেগে গেছে। দু'চোখ বোজা; মুখটা ফ্যাকাশে পাণ্ডুর।

নীপাভাবী মেয়েটাকে ও অবস্থায় দেখবে, কল্পনা করেনি। নিপা যেমন অগ্নিমূর্তি ধারন করে গিয়েছিলো, তার অবশিষ্ট আর কিছুই রইলো না। ফ্যালফ্যাল করে মৃতপ্রায় শায়িতা সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো। অন্যহাতে ধরাই রইলো টাকার ব্যাগিল।

নিপাভাবী এগিয়ে গেলো। সোনিয়ার বিছানার কোনটাতে বসলো। বিছানাটা একটু নড়ে উঠলো। সোনিয়া চোখ বন্ধ করেই

ধীরকণ্ঠে বললো, 'আপা বিরক্ত করিসনে আমায়, আমি যাবো না। কিচ্ছু খাবো না, কিছুতেই খাবো না। সব দোষ তোর। আমি মরবো, চাইনা বাঁচতে। আমার সব শেষ তো। তুই তো তাই চেয়েছিলিস, নাহলে এতোপরে বলবি কেন?'

নীপা আরো খানিকটা এগিয়ে সোনিয়ার মাথার কাছে বসলো। একটা হাত ওর কপালে রাখলো। মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো।

'কে!' হাতটা টিপে সোনিয়া বুঝলো, এ ওর রিনিপা' নয় চোখ মেললো। নিপাকে দেখে চমকে উঠলো। দু'চোখে ভয়ের ছাপ। নিশ্চয় নিপা ওকে অপমান করতে এসেছে। 'নিপাভাবী, আমাকে মাপ করুন। আমি না থাকতে পেরে সেদিন রকিব ভাইয়াকে বলে দিয়েছিলাম। আর কখনোই এমন ভুল হবে না।' সোনিয়া দুর্বল শরীরে অনর্গল কথা বলে হাঁপাচ্ছে।

'ভুলতো তুমি করনি সোনি। সেদিন রকিবকে না খবর দিলে আমার অবস্থাটা কি হতো একবার ভাবতো, মা তো মারা গেছেন, আমি একলা একটা মেয়ে। ঘরের চাকরানীটাও হাসপাতালে গেলো। কি বিপদ থেকেই না তুমি আমাকে সেদিন বাঁচিয়েছো।' নিপা কি বলবে বলে এসেছিলো, অথচ কি বলছে? সম্পূর্ণ বিপরীত।

'তুমি তাহলে রাগ করোনি ভাবী?'

'না, এসেছি কৃতজ্ঞতা জানাতে। শুধু কি তাই? তুমি তোমার জমানো টাকা দিয়েও তো আমার উপকার করেছো ভাই।' টাকাটা সযত্নে লুকিয়ে আড়াল করে রাখলো।

'রকিব ভাই বলে দিয়েছে ?'

'ওসব কথা বাদ দাও। এখন বলো, তোমার এমন অবস্থা কি করে হলো। তুমি নিজের ওপর এমন অত্যাচার করছো কেন ?'

'অত্যাচার।' হাসতে চেষ্টা করলো সোনিয়া, 'এ তো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি ভাবী।'

'না খেয়ে খেয়ে মরলে আমার কিইবা করার আছে ?' কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো সোনিয়ার মা। ঘরে অপরিচিতা নিপা ভাবীকে বসে থাকতে দেখে থমকে গেলো।

'আমি নিপা।' পরিচয় করার জন্য উঠে দাঁড়ালো নিপা, 'সোনিয়া আমাকে ভাবী বলেই ডাকে।'

'বসো মা।' অভিনেত্রী মা। ঢং করেই কথাটা বললো। 'তুমি ওকে বোঝাও। আমি তো পারলাম না। আমি যাই। তোমার জন্য চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'জ্বি আচ্ছা।' নীপাভাবী বসে পড়লো। একটা হাত দিয়ে সোনিয়ার হাত টেনে নিলো। কচলাতে লাগলো, 'সোনিয়া।'

'জ্বি।'

'সেদিন তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছিলাম। সে রাগ কি এখনও আছে ?'

'না।' হাসতে চেষ্টা করলো সোনিয়া। ক্লান্ত দুটো ঠোঁট ছড়িয়ে দিলো। 'আমি তো ভুলেই গেছি।'

'কিন্তু সোনিয়া, এখন যে আবার তোমাকে বকতে এসেছি।'

'বকুন। ওটা আমার পাওনা। সেদিন আপনার কথা না শুনে যে ভুল আমি করেছি···' কথা আঁটকে গেলো সোনিয়ার।

দু'চোখ বেয়ে অশ্রু দরদর করে গড়িয়ে বালিশ পর্যন্ত স্পর্শ করলো।

'ছিঃ সোনি কাঁদে না।' নিপা চোখের জল মুছিয়ে দিলো। 'পুরনো কথা বাদ দাও। মনে রাখবে, যখন একটা মানুষ ভাবে, তার সবকিছুই হারিয়ে গেছে, তখনও মনে রাখা উচিত, সব কিছুই কেউ কখনও হারায় না, ভবিষ্যতটুকু রয়ে যায়।'

'ভবিষ্যত? আমার?' কান্না চোখেও হাসির বিদ্যুৎ-ঝলকানি যেন একবার চমকে উঠলো। 'একটা পবিত্র প্রেমকে উপেক্ষা করার পর আর কি-ই বা ভবিষ্যত থাকতে পারে? একজনের তীব্র ঘৃণা, এক মায়ের বুক ভরা শুন্যতার অভিশাপ নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকতে বলেছেন?'

'হ্যাঁ তাই বলছি।' গম্ভীর হয়ে উঠলো নিপা। 'তুমি ছোট মানুষ, কতটুকু বুঝ? জীবনের দর্পণ তুমি দেখনি। যা ঘটে গেছে তা অসামান্য কিছু নয়। সামান্য। এ ভুল তুমি এবং সিমুল সহজেই খুব পারবে শোধরাতে। কিন্তু তুমি আত্মঘাতি হতে গিয়ে যে ভুল করছো তা-কি কখনও পারবে শোধরাতে?'

'আমি এখন কি করবো ভাবী? আমাকে বলে দাও। এতো যন্ত্রণা আমি আর বহন করতে পারছি না।' সোনিয়া শিশুর মতো অঝোরে কাঁদতে লাগলো। মাথাটা সোনিয়ার কোলে আছড়ে ফেললো। নিপার রানে মাথা ঠুকে ঠুকে কাঁদতে লাগলো। 'আমি সিমুর কাছে ক্ষমা ভীক্ষা না করে মরতে তো চাই না। কিন্তু বেঁচে থাকতে যে আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে ভাবী।'

'শান্ত হও সোনি। প্লিজ। থামো।' ওকে বুকে টেনে নিলো ভাবী। 'তুমি তোমার সব ভাবনা আমার ওপর ছেড়ে দাও। যা করতে হয়, সব আমি করবো। সিমুল আর তোমার দায়িত্ব আজ থেকে আমার। কিন্তু তার আগে তোমাকে কথা দিতে হবে, আমি যা যা বলবো তোমাকে, ঠিক ঠিক তাই করতে হবে।'

'করবো।' চোখের পানি মুছে ফেললো সোনিয়া।

'তাহলে এই মুহূর্ত থেকে আবার ঠিকমত খেতে শুরু করো। নিজের প্রতি যত্ন নাও।'

'কিন্তু···'

'কোন কিন্তু নয়। নাও। হা করো।' সামনে রাখা খাবার সোনিয়ার মুখে তুলে দিলো নিপা। 'এই তো লক্ষ্মী বোন আমার।'

'ভাবী সব ঠিক করে দেবে তো?'

'আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি না।'

'সব ঠিক হবে তো?'

'হোপ ফর দি বেস্ট।'

নয়

নিপা ভাবীর চিঠি পেলাম।

পোষ্ট অফিস গিয়ে চিঠিটা আমাকে ছাড়াতে হলো। বাংলাদেশ থেকে রেজিষ্ট্রি করে চিঠি পাঠালে, এক অসুবিধা। পিয়ন ঘরের ডাকবাক্সে ফেলবে না। খোঁজাখুজি করবে। খবর পাওয়ার ব্যবস্থা করবে। তখন নিজেকে সব কাজ বাদ দিয়ে চিঠি নিতে পোষ্ট অফিসে যেতে হয়।

আর এদেশে আমরা, বাঙ্গালীরা এতো ব্যস্ত থাকি, তা ঢাকায় বসে চিন্তাও করা যাবে না। আমেরিকাতে রেজিষ্ট্রি না করে চিঠি পাঠানোই ভালো।

চিঠির ওপরে লেখা ঠিকানা। হাতের লেখা দেখেই বুঝতে পারলাম, এ চিঠি নিপা ভাবীর লেখা। গাড়ীতে বসেই একহাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলাম। প্রবাস জীবনে একটা চিঠির মূল্য অনেক। বাসায় এসে খুললাম। পড়তে শুরু করলাম।

প্রিয় সিমুল,

শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা কামনা করেই শুরু করছি। বেশ কিছু দিন যাবৎ তোমার হাতের লেখা না পেয়ে ভালো লাগছে না। ওখানে লালপরীদের পেয়ে আমাকে ভুলে গেলে না-কি? এবং তাই তো স্বাভাবিক। চিঠি লেখা একটা আর্ট। তা আমার

অজানা। তাই আমি নিপা, তেমন গুছিয়ে লিখতে পারবো না। তা না হলে ভূমিকা কেউ এত বাজে কথা দিয়ে বড় করে?

তোমার পড়াশুনা কেমন চলছে? নিশ্চয় খুব মন দিয়ে কাজটা করছো। স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া খুব সহজ ওখানে। কিন্তু উপযুক্ততা অর্জন করা অনেক কঠিন সাধনার ব্যাপার। তবে তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস অগাধ। দেশে বড় ঝড়ই তোমাকে নীড়চ্যুত করেছে, এই কথাটা সর্বদা মনে রাখবে। এখন ছোট ঝড়ে লক্ষ্যচ্যুত হওয়া মানাবে না।

মা ভালো আছেন। নামাজ পাটিতে বসে তোমার জন্য দোওয়া করেন। আব্বার ধারণা এখন অন্যরকম। তোমার ফেরত পাঠানো ডি, ডি এনক্যাশ করিয়েছেন। তুমি যে টাকার চেক পাঠিয়েছো তা-ও সোনালী ব্যাঙ্কের ওয়েজ-অনার্স ব্রাঞ্চে ভাঙ্গিয়েছেন। তবে তিনি খুব প্রসন্নচিত্তে এ টাকা গ্রহণ করতে পারেন নি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শুনেছি—সিমুল আমার ওপর অভিমান করে আমার টাকা ফিরিয়ে দিয়েছে।

তোমার বড় ভাই ভালো। একটা দৈনিকে নিয়মিত "পরিবেশ" নিয়ে লিখছেন। ভারী সুন্দর ওনার লেখা, বাজারে খ্যাতি পাচ্ছেন। উনি লোকটাও ভালো। তোমার মতো পাকা বদমাশ নন। ভাইয়ার মাধ্যমে তুমি আমাকে পঁচিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছো, পেয়েছি। কিন্তু ও টাকা আমি কি করবো? আব্বা আম্মার দয়াতে খাওয়া পরা বেশ চলে যাচ্ছে। চাকুরিও করতে হচ্ছে না। তুমি আর আমায় টাকা পাঠাবে না। দরকার হলে আমি চেয়ে

পাঠবো। তবে তোমার টাকা দিয়ে একটা কাজই করার আছে (একটু ফাজলামো করি) আমার স্বামীর (তুমি যাকে তাল পাতার সিপাই বলে হাসতে) কবরের ওপর একটা সৌধ নির্মাণ করতে পারি। আমার মতো তুমিও জেনে খুশি হবে, জানোয়ারটা গত মাসে মরে নিজে বেঁচেছে, আমাকেও মুক্ত করে দিয়ে গেছে।

তারচে' বরং টাকাটা তুলে রাখি। ঐ টাকা দিয়ে কিছু একটা গড়িয়ে তোমার বৌ দেখবো। তোমার বৌ এর কথা যখন উঠলোই তখন আরো ক'টা কথা তোমাকে না লিখে পারছি না। মনে পড়ে? মনে পড়ে তোমার "পিচ্চি বৌ" কে? সোনিয়াকে··"

ওহ্ নো। আমি আর পড়তে চাই না চিঠিটা। দু'হাতে দুমড়ে মুচড়ে হাতের মধ্যে ফেলে কচলাতে লাগলাম। আই হেট হার। শি ইজ হার্টলেস ওয়ান। আর হৃদয়হীনার কথা জানতে চাই না। চিঠিটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেললাম।

ফ্রিজ খুলে কনিয়াকের বোতল টেনে বের করলাম। ছিপিটা মড়মড় শব্দে বামে ঘোড়ালাম। গ্লাসে ঢাললাম। আইস মেশালাম। গলায় ঢাললাম। পুড়ে যাচ্ছে গলাটা। চোখ দুটো গরগরে লাল হয়ে উঠছে, বুঝতে পারছি। মাথাটা ভারী হচ্ছে ক্রমশ। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করছে – সোনিয়া, শি ইজ ডেড টু মি।

কান্না চাপতে পারছি না। বুকের ভেতর কে যেন একটা বড় পাথর চেপে আমার কান্নাকে আঁটকে রাখতে চায়ছে। দু'চোখ ফেটে পানি বের হচ্ছে। সোফার হাতলে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু পড়ছে।

কি লিখবে নিপাভাবী? জানি আমি সব জানি। নিষ্ঠুর পাষাণী

সম্পর্কে নিপাভাবীর কি-ইবা লেখার আছে? হয়তো লিখেছে—তুমি যাকে তোমার পিচ্চি বৌ ভেবে তোমার মনের মন্দিরে দেবীর আসনে বসিয়ে পূজা দিতে। আজ সে সাইমুমের হাত ধরে তোমার সেই মন্দির মাড়িয়ে নতুন মন্দির গড়েছে। তোমারই অজস্র ত্যাগের বিনিময়ে, একটু একটু করে গড়ে তোলা মন্দিরে পদাঘাত করছে।

হয়তো ভাবী লিখেছে—ছাদ থেকে দেখি, তোমারই অতীতের প্রেম আজ ঝর্ণার মতো কলকলিয়ে সাইমুমের হাত ধরে দম্ভভরে ঘর থেকে বের হচ্ছে।

হয়তো ভাবী লিখেছে—সোনিয়া আজ আর তোমার কেউ নয়। ওকে দেখে, ওর চাল-চলন দেখে মনে হয়, ও কোনদিন কোন (তোমার) ছেলের সাথে কখনও প্রেম করেনি।

মদের নেশা তীব্র হচ্ছে। মাথাটা ঝিনঝিন করছে। বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটাই হচ্ছে। সারা দেহ কাঁপছে। একসময় গড়িয়ে পড়লাম মেঝেতে।

ভাবী এমন না লিখে অন্যকিছুও তো লিখতে পারে। হয়তো লিখেছে সোনিয়ার বিয়ে। সোনিয়ার বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে।

না না তা কি করে সম্ভব? ওর বড় বোনদের তো এখনও বিয়ে হয়নি। ওদের বাদ দিয়ে ছোটবোনের বিয়ে আমাদের দেশে তো হয় না।

কিন্তু সোনিয়ার বিয়ের কথাটা মনে হতে আমার কষ্টটা আরো বাড়লো যেন। বুকের ভেতরে যেন ট্রাকটর চলছে। ট্রাকটরের ধারাল ফলায় যেন বুকের পাঁজর ছিঁড়েছুঁড়ে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। এমন

হচ্ছে কেন? কেন? তাহলে কি সোনিয়াকে হারানোর ব্যথা এখনও বুকে জমাট বেধে আছে? তার মানে, সোনিয়ার জন্য আমার যত ক'ট তা এখানেই শেষ নয়? ওর জন্য আরো ক'ট জমা আছে? ওকে আবার একবার নতুন করে হারাতে হবে ওর বিয়ের সময়। ওহ মাই গড।

আর যদি এমন হয়? নিপাভাবী যদি লিখে থাকে—সোনিয়া পালিয়ে গেছে। নিপাভাবী তো সায়মুমকে চেনে না। হয়তো লিখেছে—একটা ছেলের সঙ্গে সোনিয়া পালিয়েছে।

তাহলে?

একটা সিগারেট ধরালাম। পাফ করলাম। হাত কাঁপছে। দু'বার আগুন কর্পেট ছুঁই ছুঁই করলে, হাত টেনে নিলাম। এরকম অবস্থা বিপজ্জনক। যেকোন মুহূর্তে আমি জ্ঞান হারাতে পারি। নেশায় বুদ হয়ে পড়তে পারি। তাহলে আমার সিগারেটের আগুন একটা অজানা বিপদ ঘটাতে পারে। তাড়াতাড়ি সিগারেটটা এ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলাম।

এমনও তো লিখতে পারে—সোনিয়া ভেগে গিয়ে একটা ছেলেকে বিয়ে করেছে। ওর বাবা মা মেনে নিয়েছে অথবা মেনে নেয় নি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন দুঃখ হচ্ছে কেন? নিজেও আন্দাজ করতে পারছি না। চিঠিটা কি পড়া উচিত ছিলো? না পড়ে কৌতূহল আরো বাড়ল? চিঠিটা নষ্ট করে ভুল করলাম?

এ্যাশট্রের দিকে তাকালাম। ওটাতেই চিঠিটা কুটিকুটি করে ফেলেছিলাম। আগুন চিঠির ছেঁড়া টুকরোগুলোকেও বাঁচতে দিলো না। কাগজ পোড়া গন্ধে ঘর ভরে গেলো। ধুয়া উড়ছে। সোনিয়ার অজানা সংবাদ সুদূর আমেরিকায় ধুয়া হয়ে উড়ে যাচ্ছে। ধুয়ার মাঝেই হারাচ্ছে আমার হৃদয়হীনা সোনিয়ার অস্তিত্ব।

আমার দুচোখ জড়িয়ে আসছে। গ্লাসটা হাত ফসকে বের হয়ে গেলো। আমি মাথার ভার কার্পেটের ওপর ছেড়ে দিলাম। চোখ বন্ধ করলাম। ঘুরছে। দুনিয়া ঘুরছে। আমেরিকা ঘুরছে। সেই আমেরিকাতে অন্ততঃ সোনিয়া নেই, এই আমার সান্ত্বনা। দু'চোখ ঘুমে হারিয়ে গেলো।

দশ

সনির কথা ভাবছি

সনি কি সেদিনের সেই ব্যাপারটা টের পেয়ে গিয়েছিলো? আমি কি সব দোষ মিছিমিছি ওকেই দিচ্ছি?

কিন্তু সেদিন তো রিনিই পাগল হয়ে গিয়েছিলো। সে ইতো আমার কাঁধে কামড় বসিয়ে দিয়েছিলো। আমাকে জড়িয়ে ধরে নিষ্পেষণ করেছিলো। জোর করে আমাকে বুকে টেনে নিয়েছিলো।

আমি তো কাতর স্বরে বলে উঠেছিলাম, 'আজ আর নয় রিনি প্লিজ।'

চোখের সামনে আজও রিনির সেই পাগলামী ভাসছে। মদে চুমুক দিলাম। বেশ লাগছে। হালকা হালকা গোলাপী নেশা হয়েছে।

'আজ আর নয়, রিনি প্লিজ।'

'ইশ-চুপ।' রিনি বলেছিলো।

'পরে · পরে রিনি প্লিজ।'

'আহ! তুমি যে কি!'

'কি বলবে বলো না?'

'পরে কবে আসবে, কখন!'

'যখন বলবে তুমি।'

'এখন অসুবিধা টা কি?'

'আছে, তুমি বুঝবে না।'

'ক্যানো?'

'অসুখ—অসুখ, আমার অসুখ আছে ··ঔষধ খাচ্ছি।'

'কি অসুখ?'

'সিফি···সিফিলিস।'

সেদিন আমি মিথ্যা কথা বলেছিলাল। আমি তো সেদিন নিজেকে অনেক কম্পেট চেক দিয়েছিলাম।

কিন্তু কার জন্য?

সে-তো সোনিয়ার জন্যই।

দু'চোখ আমার ঘুমে ঢুলুঢ়ুলু। সোফাতেই কাত হয়ে পড়লাম। গ্লাসটা পাশে ফেলে রাখলাম।

'সোনিয়া, সোনিয়া।' চিৎকার করে ডাকলাম।

আমার সোনিয়া একাকী একটা নির্জন রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে। দু'পাশে কাশফুল। পায়ে চলার পথ, একটু এগোলেই মরা নদী। শুধু রাশি রাশি বালু।

চিৎকার করে ডাকলাম, 'সোনিয়া, তুমি কি আমায় শুনতে পাচ্ছো?'

'পাচ্ছি।'

'তাহলে থামছো না কেন?'

হি হি করে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো সোনিয়া। চলার গতি বাড়িয়ে দিলো।

'এই দুষ্টু মেয়ে থামছো না কেন?'

'এই তো থামছি।'

কিন্তু ওর থামার লক্ষণ নেই। ছুটছে। আমিও পিছন পিছন ছুটছি। চারপাশে তাকাচ্ছি। জায়গাটা সম্পূর্ণ অপরিচিত। চিনতে চেষ্টা করেও পারছি না।

'তুমি খুব ভালো সনি, থামো প্লিজ।'

'তুমি আমাকে ঐ নামে ডাকো; তাহলে থামবো।'

'কি নামে?'

'ভুলে গেছো?' থেমে পড়লো সোনিয়া। আমার দিকে মুখ ফেরালো। ও যেন ছুটতে ভুলে গেলো নিমেষেই। ফ্যাল ফ্যাল করে আমার পানে চেয়ে রইলো।

আমিও ভ্যাবাচাকা খেয়ে সোনিয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। ওর দু'চোখ ভরা পানি টলটল করছে। 'কি কথা সোনিয়া?'

'কিছুই মনে পড়েনা তোমার?' সোনিয়ার কণ্ঠে ঝরে পড়লো একরাশ অভিমান।

'মনে পড়বে, আগে বলো, তুমি আমাকে খুব ভালোবাসো।'

'ও আমি পারবো না।'

'তাহলে মনে পড়বে কি করে?'

'বলতে হবে কেন? তুমি বোঝো না?'

'বুঝি, সোনিয়া বুঝি, তবুও মন চায় তোমার মুখে কথাটা শুনতে।'

'তুমি একেবারে ছেলে-মানুষ।'

'তুমি কেমন আছো সোনি?'

'যেমন রেখেছো।'

'আমি কি তোমাকে খুব কষ্টে রেখেছি সোনি?'

'খু-উ-ব।'

'কেন গো?'

'তুমি জানো না?'

'না।'

'তুমি আমাকে অনেক অনেক কষ্ট দিচ্ছো সিমুল। আমার বুকের সবটুকু ব্যথাই তো তোমার জন্য। আজ আমার কান্নার কারণ তুমি। তোমার জন্য শুধু কান্না পাই। কাঁদতেও পারি না। কাঁদার জন্য যেটুকু শক্তি দরকার, সেটুকুও আমার শেষ হয়ে যাচ্ছে। এমন কেন হলো সিমু? তুমি আমাকে দুঃখ দিয়ে কি সুখ পাচ্ছো?'

সোনিয়ার দু'চোখ বেয়ে হু হু করে কান্নার স্রোত নামছে। আমি দেখছি। আমি ওর কান্না সহ্য করতে পারি না। আমারও কান্না পাচ্ছে। অজানা ব্যথায় বুকের ভেতরটা মোচড় দিচ্ছে। টনটন করছে। সোনিয়ার হাতটা চেপে ধরলাম। নিজের বুকের সাথে চেপে ধরলাম। 'সোনিয়া, আমার পিচ্চি বউ, শুনতে পাচ্ছো আমার হৃদয়ের কান্না? হাতের স্পর্শে অনুভব করতে চেষ্টা করো, এ বুকের সবটুকু জুড়েই তো তুমি। আমার পিচ্চি বউ।'

'মনে পড়েছে তোমার?' আমার হাত ধরে ঝাঁকি দিলো সোনিয়া। 'তোমার পিচ্চি বউ'র কথা তাহলে মনে আছে তোমার?'

'থাকবে না মানে? বলো কি? জন্ম-জন্মান্তর মনে থাকবে। তুমি যে গত জন্ম থেকে আমার সাথী। এ জন্মেও পেয়েছি তোমাকে। আগামী জন্মেও তুমি আমার। আমরা দু'জন যে দু'জনার।'

'সত্যি? সত্যি!' চোখের পানি হাতের চেটো দিয়ে মুছে নিলো সোনিয়া। হাসলো। সেই হাসি—যে হাসির তুলনা শুধু সোনিয়াই। তার রাঙা ঠোঁট বাঁকিয়ে, মুক্তা-সাদা দাঁতের ঝলকানি দিয়ে গালে ঢোল ফেলে, সমস্ত মুখ জুড়ে বিদ্যুতের চমক খেলিয়ে, মুখে অপূর্ব এক চিমটি মায়া মাখিয়ে ও হাসলো। আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম।

'এই অমন করে কি দেখছো?'

'তোমাকে।'

'যাহ্।'

'কেন?'

'লজ্জা করে তো।'

'তাই!'

'হু।'

'ওরে আমার দুষ্টু বউ, তোমার আবার লজ্জাও করে?'

'ভালো হবে না কিন্তু।'

'খারাপ তো হবে।'

সোনিয়া তখন আবার চলতে শুরু করেছে।

'ফের আমায় ফেলে যাচ্ছো।'

'এসো না।'

'কোথায় ?'

'ঐ নদীর ধারে।'

'ওটা তো মরানদী, শুধু ধু ধু বালি।'

'হোক না মরা একদিন তো এখানেই পানি উথাল পাতাল করতো। আজ না হয় মৃত। আমরা নাহয় মৃত নদীর পাশেই বসলাম। এসো।'

'বসবে কোথায় ? সব তো বালি।'

'আজ না হয় বালুতেই বসবো। মাটির কাছাকাছি।'

'অবশ্য নরম বালুতে গড়াগড়ি করতে খুব মজা।'

'অসভ্যতামী করবে না কিন্তু।'

'এখানে কেউ নেই। শুধু আমি আর তুমি।'

আর ধু-ধু বালু।'

'তাতে হয়েছে টা কি ?'

'হয়নি কিছু কিন্তু তোমার মতলবটা কি, শুনি।'

'আমি আজ আমার পিচ্চি বউ এর কোলে মাথা রেখে শোবো।'

'ইস শখ কতো।'

'তোমার কোলে শুয়ে নীল আকাশে উড়ে যাওয়া মেঘ দেখবো। ওরা কেমন করে দূর-দূরান্তে উড়ে যায়। আমার যা ভালো লাগে উড়ে যাওয়া মেঘ দেখতে।'

'তাহলে রোজ রোজ এখানে এলেই পারো।'

'রোজ কি আমার পিচ্চি বউ সাথে থাকবে না-কি ?'

'ব্যবস্থা করলেই তো পারো।'

'ওরে বাব্বা। আমার পিচ্চি বৌ এসব কিসের ইঙ্গিত দেয় ?'

ওকে রাগাবার জন্য বললাম, 'তার মানে বিয়ে করার জন্য আমাকে প্ররোচিত করছো ?'

'আমি প্ররোচিত করছি ? তার মানে, নিজের একটুও ইচ্ছে নেই তাই না ?' গাল ফোলালো সোনিয়া। 'যাও তোমার সাথে কোন কথা নেই।'

'নেই বললেই হলো ?' জড়িয়ে ধরলাম সোনিয়াকে। ওর বুকের ওপর আমার বুক রাখলাম। ওর নরম বুকের স্পর্শে আমার সারাবুক প্রশান্তিতে ভরে গেলো। দু'বাহু বন্ধনে ওকে আরো নিবিড় করে নিলাম। সোনিয়া একটুও আপত্তি করলো না। চুপটি করে বন্দী পাখির মতো আদর নিতে লাগলো। আমি ওর পিঠে হাত বুলাতে লাগলাম।

'সোনি—।'

'হু।'

'একটা অদর করি।'

'নাহ্।'

'কেন ?'

'আমার ভয় করে ?'

'কিসের ভয় ? আমি তো তোমার পাশে।'

'যদি কেউ দেখে ফেলে।'

'ফেলুক।'

'কিছু হবে না ?'

'কিচ্ছু হবে না।'

'কিন্তু আমার যে লজ্জা করে।'

'চোখ বন্ধ করে থাকবে।'

'তবুও···।'

'লক্ষীটি, আমাকে বাধা দিয়ো না। এখানে কেউ নেই। শুধু একটিবার। একটিবার তোমার ঠোঁটে ঠোঁট রাখবো। দেখো কত ভালো লাগবে। এটাইতো সবচে বড় আদর।'

'আর কখনও করবে না তো?'

'না, শুধু আজকে। একটিবার।'

'করো। যলদি। কেউ এসে পড়বে।'

আমি আমার মুখটা খুব ধীরে ধীরে তুলছি। সোনিয়া মূর্তির মতো বসে রয়েছে। ওর মুখটা লজ্জাই রাঙা হয়ে গেছে। লজ্জাই নিঃশ্বাস চেপে রয়েছে। ওর সারা দেহ কাঁপছে।

'সোনিয়া।'

'হু।'

'ঠোঁটে ঠোঁট রাখছি কিন্তু।'

'রাখো।'

'তুমি দেখবে না?'

'না '

'একটি বার তাকাও, তোমার সিমু তোমার ঠোঁটে ঠোঁট রাখবে। দেখতে ইচ্ছে করে না?'

'যাও!'

'তাকাও লক্ষীটি।'

'আগে রাখো।'

আমি ঠোঁটটা শুধু ওর ঠোঁটের কাছে নিয়েছি। ব্যাস। সোনিয়ার

মুখটা কুঁচকে উঠলো। দ্রুত ও ওর ঠোঁট টেনে নিলো। স্প্রিং এর মত সরে গেলো। আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো। 'ছিঃ কি দুর্গন্ধ, তুমি মদ খেয়েছো? ছিঃ ছিঃ।'

'সোনিয়া।'

'আই হেট ইউ।'

'সোনি।'

'আমার নাম তুমি ওমুখে নেবে না। তোমার এতো অধঃপতন হয়েছে। তুমি মদ খেয়ে আমাকে স্পর্শ করেছো।'

'আর কখনও এমনটি হবে না। এবারের মতো মাপ করে দাও।'

'না, তোমার মাপ নেই। তুমি অনেক বড় অন্যায় করেছো। তুমি মাতাল। তুমি মদখোর।'

'এই হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছি। লক্ষ্মীটি আমার, এবারের মতো মাপ করে দাও।' খপ করে সোনিয়ার একটা হাত চেপে ধরলাম। 'এই তোমার হাত ধরে ওয়াদা করছি, আর কখনও আমি মদ খাবো না। এবারটি মাপ করো। দেখো ভবিষ্যতে কখনও যদি খাই। তোমার কসম খেয়ে বলছি। আর মদ খাবো না। একটি বার আমার কথাই বিশ্বাস করে দেখো।'

'না, তোমার ক্ষমা নেই। আমি কিছুতেই পারবো না তোমাকে ক্ষমা করতে।' সোনিয়া জোর করে ওর হাত টেনে নিলো।

আমি ওকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম। ও সরে গেল। আমার মাথায় নেশা। ভারসাম্য বজায় রাখতে পারলাম না। হুড়মুড় করে পড়ে গেলাম।

হুড়মুড় করে পড়তেই ঘুমটা ছুটে গেলো। আমি সোফা থেকে গড়িয়ে পড়েছি নিচে। সোনিয়ার কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, নিজেও জানি না।

তাহলে পুরো ঘটনাইাই স্বপ্ন।

হ্যাঁ স্বপ্ন।

চোখ মেললাম। দু'চোখ আবার জলে পরিপূর্ণ। স্বপ্নে কেঁদেছিও তাহলে! ঘরভর্তি আলো। বাতি না নিভিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আলোতে চোখে পড়লো, মদের বোতলটা। কেন জানি রাগ হলো। ওটার গলা ধরে বাথরুমে গেলাম। কমোডে সবটুকু ঢেলে ফেলে দিলাম। কেন যে একাজটা করতে গেলাম, তা নিজেও জানি না।

ড্রইংরুমে বাতি নিভিয়ে বেডরুমে গেলাম। শুয়ে পড়লাম। শুধু এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম। কিছুতেই দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। যাকে মন থেকে মুছে ফেলতে এতোদূর আসা। যাকে জেগে কখনও ভাবতে চেষ্টা করি না। যাকে ভোলার জন্য আমি উদগ্রীব। যাকে আমি ঘৃণা করি—

সে স্বপ্নে কেন এমন করে এলো?

বুঝিনা।

ওকে তো আমি ভুলতে চাই।

তবুও মনে হচ্ছে—ঘুমটা না ভাঙ্গলেই ভালো হতো।

এগার

নিপা চাকুরি পেয়েছে।

নিপা ঢুকলো রকিবের ঘরে। রকিব খবরটা মায়ের কাছ থেকে জেনেছে আগেই। কোনো মন্তব্য করেনি। নিজের ঘরে এসে জানালার পাশে দাঁড়িয়েছে।

'আপনি খুশি হন নি?' নিপা ঘরে ঢুকে খুব মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

রকিব এমন ভাব করলো যেন কিছু শুনতে পায়নি। নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ার চেষ্টা করলো। টেবিলে রাখা সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা বের করলো। জ্বালালো। একমনে টানতে লাগলো।

'অবহেলা আমার একদম অসহ্য।'

'কে করেছে অবহেলা?'

'এই তো করছেন আপনি।'

'কই না তো।'

'তাহলে আমার কথা শুনছেন না কেন?'

'শুনছি, বলে যান।'

'আমি একটা মালটিন্যাশনাল কোম্পানীতে সেক্রেটারীর চাকুরি পেয়েছি।'

'জানি।'

'জানেন?'

'মা বলেছেন।'

'কোনো মন্তব্য করলেন না যে।'

'নিজের সিদ্ধান্ত অন্যের ঘাড়ে চড়িয়ে দেওয়ার মতো বোকা আমি, এমন ধারণা আপনার কি করে হলো?'

রকিবের কথা কাঁটা বেঁধার মতো বিঁধলো নিপার শ্লেষপূর্ণ। সরাসরি উত্তর দিলেই পারতো। ত না করে উল্টো একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো নিপার মনে হলো, এখন একটা কৈফিয়ৎ দেওয়ার দরকার।

'মানে, মা মারা যাওয়ার সময় অনেক টাকা ঋণ হয়ে গেছে। আপনি পাবেন, সোনিয়া পাবে তা ছাড়া আমার তো কিছু একটা করা দরকার। এভাবে আপনাদের ভালোমানুষির সুযোগ নিয়ে, আপনাদের ওপর বোঝা হয়ে থাকাও তো ঠিক নয়। তাছাড়া আমারাও তো একটা ভবিষ্যত আছে। মা-বাবা আমাকে খুব স্নেহ করেন, তাই বলে তাদের আর্থিক দিকটাও তো বিবেচনা করা দরকায়। আসলে আমার কিছু একটা করা উচিত

'শেষ হয়েছে?' সিগারেটটা জোর করেই নিভালো রকিব।

'কি!' নিপা রকিবের কথা বুঝতে পারলো না।

'তোমার বলা, সরি আপনার বলা শেষ হয়েছে? আমার হাতে এখন কোন কাজ নেই, তাই বলে আপনার এসব ফালতু কথা শোনার মতো ধীরতাও নেই।'

'কাল আমার জয়েনিং।' নিপার কণ্ঠ গম্ভীর।

রকিব আবার একটা সিগারেট প্যাকেট থেকে টেনে বের করলো। জ্বালালো। দীর্ঘ টান দিলো। ভুস ভুস করে ধুয়া ছাড়লো।

'আসলে...আপনার টাকাটা, সোনিয়ার টাকাটা···।'

'টাকাটা কি একমাসের বেতন থেকেই শোধ করতে পারবেন?'

'তা কি করে পারি?'

রকিব এবার মুখস্ত কবিতার মতো বলতে লাগলো। 'টাকাটা ক'মাস নিয়েছেন মনে রাখবেন। ওটা দিয়ে এতোদিনে আমার অনেক সুদ হতো। মুলটা যখন ফেরত দেবেন, তখন সুদটা ছাড়বো কেন? সুদ সহ কড়াই-গণ্ডাই ফেরত দেবেন। আমি সুদের হার গুলো বলছি, দয়া করে মনে রাখবেন। মন দিয়ে শুনুন।

প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র—৮ বছর মেয়াদী, লাভ—২১%

বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র—৫ বছর মেয়াদী, লাভ—১৮%

বোনাস সঞ্চয়পত্র ৬ বছর মেয়াদী, লাভ—২২%

ওয়েজ আর্ণার বণ্ড—৬ মাস অন্তর চক্র বৃদ্ধি হারে—২৩%

ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক—সাধারণ হিসাব—লাভ ১১½%

বোনাস হিসাব—৬ বছর মেয়াদী—লাভ—২২%

এভাবে যে ক'মাস খাটাবেন দয়া করে পাই পয়সা হিসাব করে দেবেন।

'আপনি আমার কাছ থেকে সুদ নেবেন?' নিপা হালকা হাসলো।

'সন্দেহ হচ্ছে ?'

'না মানে···'

'টাকাটা তো সুদসহ দেবনই। এখন মর্টগেজ রাখার মতো কিছু আছে ? আপনাকে তো বিশ্বাস করতে পারছি না।' রকিবের কণ্ঠে শ্লেষ। বার দুয়েক শ্রাগ করলো। 'চিনি না, জানি না, এতো-টাকা যদি মেরে দিয়ে পালিয়ে যান

'কি বলছেন এসব ?'

'ঠিকই বলছি। যদি নগদ কিছু জমা না রাখতে পারেন তাহলে কমপক্ষে স্থায়ী ঠিকানাটা লিখে দেবেন। পয়সা মেরে পালালে ; যেন পুলিশ নিয়ে যেতে পারি

'আপনি, মিঃ রকিব অহেতুক উত্তেজিত হচ্ছেন।'

'নিপা, সরি মিসেস নিপা

নিপা রকিবের মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিলো। পরিবেশটাকে কিছুটা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলো। মুখে হাসি টেনে আনলো, 'এককালে আমাকে লোকে মিসেস নিপা হাসান বলতো। কিন্তু লোকটা পটল তোলার পর থেকে কেউ বড় একটা মিসেস টিসেস বলে না।'

'আপনি একটা কাগজে লিখিত দিয়ে যাবেন। আপনাকে এতোগুলো টাকা যখন দিয়েইছি তখন ডিড থাকা ভালো

'আপনি কিন্তু আমাকে অপমান করছেন।'

নীপার ব্যক্তিত্বের মাঝে শিথিলতা বলে কিছু নেই। নিপা হারতে শেখেনি। নিপার চরিত্রটা বিচিত্র। ভুলকে কখনও প্রশ্রয় দেয়নি। আবার ভুল করলেও কখনও হা-হুতাশ করেনি। যুক্তি

দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে শুধরেছে। সারাটা জীবন মাথা তুলেই বেড়ে উঠেছে।

ছোটবেলায় ছিলো বাবা মায়ের আদুরে একমাত্র মেয়ে। কোন কিছু চাওয়ার আগেই পেয়েছে। শৈশবকালের কোন অর্জনই ওর কষ্টের নয়। বড় হওয়ার পর, বিয়ের পর, হাসান নামক একটা অপদার্থ ওর জীবন থেকে সুখ কেড়ে নিলো। তাতেও নিপার দুঃখ ছিলো না, কান্না ওর জীবনের সাথে তখনই যুক্ত হলো, যখন ও সুখের সাথে হারালো শান্তিটুকুও

তারপর থেকে ওর সব অর্জনই কষ্টের। দান আর ভীক্ষা থেকে নিজেকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছে আজও। তাইতো রকিবের টাকাটার জন্য ওর মনের নরম কোনটাতে খচখচ করে বিঁধছে। নিপা জীবনে অনেক কিছুই হারিয়েছে। মেধাবী ছাত্রী ও, ইচ্ছা করলেই নিজের জীবনটা অন্যরকম করে গড়ে তুলতে পারতো। আজ আর কিছুই হারাতে রাজী নয় ও। আসলে পিঠ তো দেওয়ালে ঠেকেছে। এখন মনে হয়, টাকাটা ফেরত দিলেই বাঁচে। এদের এমন স্নেহ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

তাছাড়া নিপার মনে পড়ে, জর্জ মুর এর কথাটা, "টাকা কখনো কখনো মানুষকে হাস্যস্পদ করে তোলে।"

নিপা কারো কাছে নিজেকে হাস্যস্পদ করতে রাজী নয়, যেমন রাজী নয়, নিজেকে ছোট করে রাখতে। কাথাটাতো সত্যি, কোন অধিকারে সে রকিবের এবং সোনিয়ার টাকা নিজের কাছে রাখবে?

নিপার ঐ এক দোষ। রাগলে মাথার ঠিক থাকে না। এর কারণটা অবশ্য ও বাবা মার একমাত্র আদুরে মেয়ে বলেই। প্রশ্রয় পেয়েছে যথেষ্ট। না চাইতেই উজাড় করে পেয়েছে। নিপা রাগলে নিজেকে সংবরণ করতে পারে না। হয় চুপ থেকে নিজের মনেই গোমরাতে থাকে, নাহয় যা খুশি তাই বলে ফেলে।

রকিবের কথা শুনে ওর মেজাজটাও বিগড়ে গেলো। লোকটা না হয় বিপদে উপকারই করেছে, তাই বলে যা ইচ্ছে তাই বলে যাবে?

নিপা রকিবের টেবিলের কাছে এগিয়ে এলো। কাগজ, কলম টেনে নিলো। খসখস করে লিখতে শুরু করলো—আমি কাজী ফারহানা নিপা, জনাব রকিবুল হাসান ওরফে রকিবের কাজ থেকে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা ধার লইলাম। যা সর্বোচ্চ হারে সুদসহ ফেরত দেবো।—নিচে এক টানে নিজের নামটা সই করে দিলো।

কাগজটাতে লিখতে গিয়ে নিপার দু'চোখ পানিতে ভরে গেলো। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। এক ফোঁটা অশ্রু কাগজে পোড়লো। কেন এমন হলো তা সে নিজেও জানে না।

নিপা নিজের কান্না থামাতে পারলো না। কান্না আপন গতিতে যেন বেড়েই চললো। কলমটা ফেলে একছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো।

নিপা চলে গেলো। রকিব আরও একটা সিগারেট জ্বালালো আয়েসী ভঙ্গিতে চেয়ারের ব্যাকরেষ্টে গা এলিয়ে পাফ করতে লাগলো। ওর হাতে ধরা নিপার লেখা কাগজটা। কাগজে নিপার

অশ্রু। ওটার উপর ক'বার হাত বুলালো। নিপার জন্য এমন কেন হচ্ছে? কষ্ট অনুভব করছে। এমনতো ওর জীবনে কখনও হয় নি। এককালে হানিকেও (সোনিয়ার বড় বোন) মন দিয়েছিলো রকিব। দু'বাড়ীর সবাই তা জানে। হানিকে নিয়ে অনেক মাতা-মাতি করেছে।

হানির বিয়ে হয়ে গেছে অন্যখানে। অনেকের ধারণা, সেজন্যই রকিব আজও কুমার। কিন্তু ওর জন্য তো বুকের ভেতর তো এমন করে কষ্ট অনুভূত হয় নি।

হ্যাণ্ড নোটটা দু'হাতের মাঝে রাখলো। হাত মুঠো করলো। দলাই মোচড়াই করে ছিঁড়লো। এ্যাসট্রেতে ফেললো। ম্যাচ মারলো। ওটাতে আগুন ধরালো। জ্বালিয়ে ফেললো নিপার লেখাটা।

'রকিব।'

'জ্বি মা।' রকিব সোজা হয়ে বসলো। 'তুমি আমার ঘরে, কিছু বলবে।'

'তুই কি চিরকাল ছেলেমানুষ রয়ে যাবি?'

'কেন মা

'মেয়েটাকে কি বলেছিস

'কাকে।'

'তুই কি একটা মানুষ? মেয়েটার কেউ নেই। স্বামী ছেড়ে দিয়েছে, মরেও গেছে। বাবা মা মরে গেছে। কি সুন্দর একটা কচি মেয়ে, কত দুঃখ ওর সারা ক ুড়ে। থাকার জায়গা নেই, যাওয়ার

সংস্থান নেই। নেহাত নিরুপায় হয়ে তোদের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। লজ্জাই লজ্জাই মেয়েটা আবার আধ-পেটা খায়, খেতে চায় না। ঐ মেয়েটাকে কাঁদাতে তোর কষ্ট হলো না?

মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে তোর ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে গেলো। গিয়ে দেখি ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে কাঁদছে। শুধু ফোঁস ফোঁস শব্দ হচ্ছে। তুই হয়েছিস একটা হৃদয়হীন। সিমুল আমার ভালো। তুই মানুষ হবি না।' মা বিড়বিড় করতে করতে চলে গেলেন।

রকিব একমনে মায়ের কথাগুলো বিশ্লেষণ করলো, বিড়বিড় বললো, 'মাগো ওকে কষ্ট দিতে আমি চাই নি

রাত অনেক। কতক্ষণ ও এভাবে বসেছিলো নিজেও জানে না রকিব উঠে পড়লো। বারান্দায় বের হলো। কেউ নেই। পা টিপে টিপে এগোলো। সোজা ছাদে। কার্নিশ বেয়ে বেয়ে নামলেই হবে, ছোট বেলায় কত নেমেছে। সামনের দরজায় টোকা দিলে অসুবিধা, কেউ শুনে ফেলবে। কার্নিশ দিয়ে নেমে জানালায় টোকা দেবে, নিপাকে দরজা খুলতে বলবে। নিপা দরজা খুললে। এদিক দিয়ে ঘুরে নিঃশব্দে ওর ঘরে ঢুকবে। ক্ষমা চাইবে।

কার্নিশে দাঁড়িয়ে চারপাশটা ভালোভাবে দেখে নিলো রকিব। না কোথায়ও কেউ নেই। জানালার কাঁচে চোখ রাখলো। উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে নিপা।

'নিপা' ফিসফিসিয়ে ডাকলো। রকিব জানালায় মৃদু আঘাত করলো।

'কে?' লাফিয়ে বিছানায় সোজা হয়ে বসলো নিপা। দরজার দিকে তাকালো।

'আমি এখানে, জানালায়।'

জানালায় ছুটে এলো নিপা। 'পড়লে পা ভাঙবে। আপনি প্লিজ ছেলেমানুষি করবেন না। মা ঠিকই বলেছেন, আপনি ছেলেমানুষ।

'তুমি দরজা খোলো। থা আছে। আমি ওদিক দিয়ে আসছি।'

'আপনি সাবধানে উঠবেন।'

'ছোটবেলায় অনেক কার্নিশে ওঠানামা করেছি। ও আমার কিছু হবে না। তুমি বরং দরজাটা খোলো। আমি তোমার ঘরে আসবো।'

'না।'

'কেন?'

'এতো রাতে আমি একা ঘরে। আমার সঙ্গে এসময় আপনার কোন কথা থাকতে পারে না।'

'পারে।'

'না।'

'তুমি খুলবে না?'

'না।'

'প্লিজ।'

'যা বলার সকালে বলবেন।'

রকিব নিপার কথার কোন জবাব দিলো না। শুধু ফ্যালফ্যাল করে ওর মুখের দিকে কিছু সময় তাকিয়ে রইলো। তারপর যেমন নিঃশব্দে কার্নিশে নেমেছিলো, তেমনই নিঃশব্দে পাইপ বেয়ে ছাদে উঠে গেলো।

বার

টোফেল করেছে সোনিয়া। খুব ভালো স্কোর উঠেছে। ষ্টেটস থেকে আই টুয়েনটি এনেছে। মোটকথা ও উঠে পড়ে লেগেছে। আমেরিকা ও যাবেই।

নিপাভাবী ওর পরামর্শদাত্রী। সে-ই ওকে দিয়ে সব কিছু করাচ্ছে। কিন্তু সোনিয়ার ভাবনা একটাই, টাকা পাবে কোথায়? ওর গ্যারেন্টার হবে কে?' তাছাড়া ওর বাবা মা প্লেন ফেয়ার দেবে বলেও মনে হয় না।

তবুও নিপা ভাবী ওকে আশ্বাস দিয়েছে। সব দায়িত্ব তার। ওর এখন একটাই কাজ—টোফেল'এ ভালো স্কোর তোলা। রাত দিন খেটেছে ও। প্রচুর পড়াশুনা করেছে। ফলও পেয়েছে হাতে হাতে। প্লেন ফেয়ার সলভেন্ট গ্যারেন্টার সব ব্যবস্থা নীপাভাবী করবে বলে জানিয়েছে।

সোনিয়া এখন অনে টা স্বাভাবিক। আগের মতো পাগলামো করে না। ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করে। নিজের প্রতি যত্নও নেয়। ওর এখন এক ধ্যান কখন কিভাবে ও শিমুলের কাছে পৌঁছাবে।

এখন ওর যত কষ্ট সবটুকু সিমুলের কথা ভেবে। শিমুল হয়তো ওর জন্য খুব কষ্টে আছে।

হয়তো ওর জন্য ভেবে ভেবে নিজের ওপর অত্যাচার করছে। ঠিকমত খাচ্ছে না, পড়াশুনা করছে না, হয়তো ডিঙ্ক করছে। এসব নিয়ে সোনিয়ার যত ভাবনা। তবে অন্যকোন মেয়ে নিয়ে শিমুল ফূর্ত্তি করছে, এমনটি ও ভাবতে পারে না।

সোনিয়া জানে, শিমুল চিঠিতে ওর নাম বারেকের জন্যও লেখে না। শিমুলের রাগ পড়েনি একথাই প্রমাণ করে তা। শিমুল ওকে হয়তো ঘৃণা করে। আর করলেই বা ওর কি করার আছে, এতো দুর থেকে?

মিছে কেঁদে কি লাভ (?) ঠিকই বলেছে নিপাভাবী। কেঁদে, না খেয়ে চেহারা নষ্ট করলে আর এক সমস্যা। পুরুষের জাত গ্লামার খোঁজে বড্ড বেশি। নিপা ভাবীই ওকে বুঝিয়েছে— চকচক না করলে পুরুষদের কাছে নাকি মেয়েরা ফ্যালনা। এমনিতেই ওরা ঘরের পুরনো বউকে সময় দিতে পারে না।

সোনিয়া অনেক ভেবেছে। নিজের সঙ্গে বহু বোঝাপড়া করেছে। এক একবার শিমুলকে ভুলে থাকার কথাও চিন্তা করেছে, এমনকি চিরকালের জন্য। কিন্তু না। বোধকরি তা হবার নয়। ওকে ভোলার কথা মনে পড়লেই দুচোখ ভরে পানি আসে। আসলে সব দোষ তো ওরই। কেন শিমুলকে ভুল বুঝলো? শিমুল তো অনেক ভালো ছেলে।

তবে একদিন ওর ভুল ভাঙ্গবেই, সোনিয়ার মনের জোর আছে। হয়তো পারবেও।

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলো নীপা ভাবী।

'ভাবী তুমি? তোমার না গত পরশু চাকুরিতে জয়েন করার

কথা, অর্থাৎ এখন তোমার চাকুরিতে থাকার কথা। আজ চাকুরিতে যাওনি?'

ভাবী চুপ।

'কি হয়েছে ভাবী? তোমার মুখটা অমন শুকনো কেন? কেউ কিছু বলেছে?'

'নীপা।' ভাবীর দুচোখ বেয়ে ঝরঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। দু'হাতে চোখ ঢাকলো, 'আমিও তোর মতো মরেছি বোধহয়।'

সোনিয়া দ্রুত উঠে দাঁড়ালো। দরজার ছিটকিনি বন্ধ করলো। এবার ভাবীর মাথাটা নিজের বুকে টেনে নিলো। চোখ মুছিয়ে দিলো। 'কি হয়েছে ভাবী? আমাকে যদি না যায় তাহলে বলো।

'বললে তোকেই বলবো। তুই ছাড়া আমার মনের কথা কাকে বলি? তাছাড়া এ যে আমার লজ্জার কথা। তুই ছাড়া কেউ বুঝবেও না।'

'ভাবী তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছো মনে। কে কষ্ট দিয়েছে এমন করে তোমাকে?'

'না-রে সোনি, কেউ কষ্ট দেয়নি। বরং আমিই বোধহয় কাউকে কষ্ট দিয়েছি। আজ দু'দিন সে ঘরে ফেরেনি···'ভাবী আবারও ঢুকরে কেঁদে উঠলো।

'ভাবী কার কথা বলছো?'

'নাহ কিছু না।' ভাবী দ্রুত পট বদলাবার চেষ্টা করলো। বুকে শ্বাস চেপে রাখলো। স্বাভাবিক হতে সামান্য সময় নিলো, 'এবার

তোর কথা বল। ভিসার জন্য দাঁড়াচ্ছিস কবে? আমি তোর জন্য গ্যারেন্টার ঠিক করে ফেলেছি। তার ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট এবং ব্যাংক ষ্টেটমেন্টও আনিয়েছি।'

'ভাবী তুমি কিন্তু আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছ।' কৃত্রিম অভিমানের সুরে বললো সোনিয়া।

'যদি কাউকে বলি তাহলে তোকেই বলবো।' কেশে কণ্ঠটা পরিষ্কার করে নিলো ভাবী, 'শোন, চাকুরীতে জয়েন করতে পারলাম না। মানে চাকুরি করছি না। এই তো বেশ আছি। বিনা ঝামেলাতে খাচ্ছি, ঘুমুচ্ছি। কি বলিস?' ভাবী হাসতে চেষ্টা করলো।

'ভাবী আমি কিন্তু অনেক বড় হয়েছি। কথা চাপা দিলেও অনেক কিছু বুঝি। তুমি শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করো না। তুমি আমার কাছে কিছুই লুকুতে পারবে না।'

'বল তো কি হয়েছে?'

'তুমি প্রেমে পড়েছ।'

'ওরে শয়তান।' নীপা সোনিয়ার চুল টেনে দিলো।

'বলো সত্যি কি-না?'

'আমি বুড়ি, তাও বিধবা। আমার আবার প্রেম!' দীর্ঘশ্বাস ফেললো ভাবী।

'বিধবা সধবা বুঝি না। এখনও তোমার যা চেহারা আর ফিগার তাতে আইবুড়ো মেয়ে ফেলে তোমাকে বেছে নেবে অনেকেই।'

'তাদের মতো কেউ ভুল করতে পারলেও আমি তা পারি না।'

ভাবীর কথাটা খুব গভীর। পুরোপুরি অনুধাবন করা কঠিন। তবুও কথাটাকে হালকা বিবেচনা করলো না সোনিয়া। 'ভাবী তোমার বয়স এখন আর কি? তাছাড়া কেউ যদি সব জেনেশুনে ভুল করতে চায়, তাহলে তোমার কিন্তু সাড়া দেওয়া উচিত।'

'তা হয় না সোনিয়া।'

'তার কথাটাও তোমার ভাবা উচিত। সে যদি সত্যিকার ভালো বেসে থাকে তাহলে তখন? তার জীবনে কি একটা গভীর ক্ষত হবে না?'

'কিন্তু·

'তাছাড়া ভাবী, ওদেরকে তো চিনলেনই। ওরা ভীষণ অভিমানী। অভিমান করে নিজেকে ধ্বংস করে দেবে। হয়তো আপনার কাছে আর কখনও ছোট হতেও আসবে না। রকিব ভাইকে চেনেন না। আপামনির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর কি কান্নাই না কেঁদেছিলেন। কতদিন মদ খেয়েছেন। শুধু বলেছে—ওর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরই বুঝলাম, ওকে আমি ভালোবাসি।'

'সোনিয়া' ভাবীর কণ্ঠে শাসনের সুর, 'আমি কিন্তু কারো নাম বলিনি সোনি, তোমার অগ্রিম ধারণা করা ঠিক নয়।'

'ভাবী। আপনি আমাকে মারতে পারেন, কাটতে পারেন। কিন্তু আমার মুখ বন্ধ করতে পারবেন না।' দরদরিয়ে কাঁদতে লাগলো সোনিয়া। ভাবীকে আঁকড়ে ধরলো। 'ভাবী ও-ও একরাতে অমন করে ছাদ বেয়ে কার্ণিশে নেমেছিলো। আমার জানালায় টোকা দিয়েছিলো। আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিলো। সেদিন আমি ওকে

শুনিনি। দর্ভভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলাম। সেই ভুল আপনাকে করতে আমি দেবো না। কিছুতেই না। সেদিন যদি আমি সেই ভুলটা না করতাম। তাহলে...' আবারও ভাবীর বুকে কান্নায় লুটিয়ে পড়লো সোনিয়া।

'আমিও যে একই ভুল না বুঝে করে ফেলেছি বোন!' নীপার কণ্ঠে আত্মসমর্পণের আভাস। 'এখন আমি কি করবো? কোথায় খুঁজবো ওকে? ও-যে দু'রাত ঘরেও ফেরেনি।'

'কাউকে কিছু বলে যায়নি?'

'মাকে বলেছে, বাইরে ওর নাকি কাজ আছে।'

'ঠিক আছে। আমরা খুঁজে বের করে ফেলবো। রকির ভাই যাবে কোথায়? হোটেল এমবাসাডারে মদ খেয়ে বুদ হয়ে শুয়ে আছে। যেমনটি শিমুল করতো।'

'কিন্তু'

'আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি ঠিক জানি ঐ হোটেলেই পাওয়া যাবে ওনাকে। শিমুল তো ভাইয়ার কাছ থেকেই ঐ পথ চিনিছে। আপুর বিয়ের পর রকিব ভাই প্রায়ই ওখানে যেতো, মদ খেতো।'

'তুমি এসব কি বলছো আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তাছাড়া তুমি জানলেই বা কি করে রকিব ভাইয়া কার্নিশে নেমে আমার জানালায় টোকা দিয়েছিলো, কিছু বলতে চেয়েছিলো।'

'গত পশুর রাতে আমার ঘুম আসছিলো না। তাই ছাদে চুপটি মেরে বসেছিলাম। আমাদের ছাদ থেকে খুব স্পষ্ট দেখা যায়। প্রথমে তো ভয় পেয়েই গিয়েছিলাম। পরে চুপটি মেরে সব দেখেছি।' একটু

হাসলো সোনিয়া, 'এতে লজ্জার কি আছে, আমি তো আর সেই কথাটা শুনিনি, যা রকিবভাই তোমাকে বলেছে।'

'কি কথা?'

এবার সোনিয়া হি হি করে হেসে লুটিয়ে পড়লো। 'সেই কথাটা যা সবাই জানে। আমি তোমাকে 'আবারও হেসে লুটোপুটি খেলো সোনিয়া।

'না।'

'কি না?'

'রকিব সেকথা বলতে যায় নি।'

'তাহলে।'

'সে গিয়েছিলো অন্যকথা বলতে।'

'কি কথা ভাবী?'

'আমি যেন চা রি না করি, সেই কথাটাই বলতে গিয়েছিলো।'

'আর তাই বুঝি তুমি অমন ভালো চাকুরিটা হাতছাড়া করলে? তা বেশ। ভালো করেছো। কিন্তু তোমার দুর্বলতা প্রমাণ হবার জন্য এটুকু উদাহরণই যথেষ্ট।' হি হি করে হেসে উঠলো সোনিয়া, 'আকেলমন্দ কা লিয়ে ইশারায় কাফি।'

'দুষ্টু কোথাকার।' ভাবী সোনিয়ার পিঠে চাপড় কষালো।

'ঠিক আছে ভাবী তুমি ঘরে যাও। আরামসে ঘুমোও। বিকেলের মধ্যে আমি রকিব ভাইয়া খুঁজে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো। কথা দিচ্ছি। খুঁজে বের করতে এক বেলার বেশি সময় লাগবে না আমার।'

'না।'

'কি-না?'

'আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।'

কি যেন ভাবলো সোনিয়া। 'ও. কে, কিক হ্যায়, তৈরী হয়ে এসো। সমস্যা যখন বাধিয়েছো তখন সমাধান নিজে করাই ভালো।' হাসলো সোনিয়া। ভাবীর গালটা টিপে দিলো।

'তুই যবেই পাকা হয়েছিস সোনি।'

'আমি কি ছোট আছি নাকি?'

'না তুই বড় হয়েছিস, সে দেখেই বুঝতে পারছি, বত্রিশ বুঝি এখন আর লাগে না।'

'যাহ্, অসভ্য ভাবী।' সোনিয়া দ্রুত কাপড় পাল্টাতে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো।' যাবার সময় শুধু বললো, 'ভাবীটা যে কি, লজ্জা দিতেও পারে।'

'তাড়াতাড়ি আয়।'

'তুমিও কাপড় পাল্টে তাড়াতাড়ি এসো।'

'আমি কাপড় পালটাবো না। এই কাপড়েই যাবো।'

'তোমাদের কথা আলাদা ভাবী। আল্লাহ রূপ দিয়েছেন, ছেঁড়া কাপড় পরে থাকলেও মানুষেরা হা করে গিলবে। আর আমাদের দিকে শালার ব্যাটারা ফিরেও তাকায় না। কানা শালারা।' শোবার ঘর থেকে কাপড় পালটাতে পালটাতে চিৎকার করে বললো সোনিয়া।

'জায়গা মতো কাপড় ছিঁড়ে বের হয়েই দেখো না। লোকে তাকায় কি-না? হেঁচট খাবে ভদ্রলোকেরাও।'

'ভাবী ফের বাজে কথা ?'

সোনিয়া পায়ে স্যাণ্ডেল গলাতে গলাতে ঘরে ঢুকে পড়লো।

'অসভ্য অসভ্য কথা বললে ভালো হবে না কিন্তু।'

'সভ্য কথা শিখিয়ে দাও না কে ননদী।'

'জানো না বুঝি সভ্য কথা ?'

'না

ঠিক আছে। রকিব ভাইয়াকে বলবো, আরো অনেক কিছুই শিখিয়ে দেবে।'

'এবার তুমি অসভ্য হচ্ছো কিন্তু।'

'ননদী বলে পোস্টটা তো স্থায়ী করেই নিয়েছো, এখন একটু আধটু অসভ্য কথা তো সহ্য করতেই হবে।

'ঠিক আছে, যতখুশি অসভ্য কথা বলো কিন্তু আর দেরি করো না। চলো।'

'তর সইছে না মনে হচ্ছে।'

নিপাভাবী হাসলো। ভাবীর এ হাসির তুলনা সোনিয়া খুঁজে পেলো না। মুখটা মলিন কিন্তু মলিন মুখেও হাসিটা অপূর্ব, কি অদ্ভুত সুন্দর এ হাসি। ধানের সোনালী ক্ষেতে পিছলে যাওয়া একমুঠো কচি রোদ যেনো। যা দ্রুত গোলাপী ঠোঁটের আড়ালে হারিয়ে যায়, তবুও মাঝমুখে হাসির সেই মোহময়ী রেশটা লেগে থাকে।

এমন হাসি তো পৃথিবীকেও জয় করতে পারে। নীপা ভাবীর এই হাসির তুলনা শুধু নীপা ভাবী নিজেই।

তের

এমন তো কথা ছিলো না।

আমি তো আমার জীবনটা গড়তে এসেছিলাম। ধ্বংস করার জন্য নয়। কিন্তু বাস্তবে করছি কি? মদ খাচ্ছি, লিণ্ডার সাথে আড্ডা দিচ্ছি। সারাক্ষণ পয়সা কামাবার ধান্ধা করছি। পড়াশুনার নামে অষ্টরম্বা।

পয়সার পিছনে কিভাবে দৌড়াচ্ছি ত নিজের ভাবতেও অবাক লাগে। শার্টটা ধোবার সময় পর্যন্ত হয় না। ময়লা হলে ফেলে রাখি, নতুন একটা কিনি। ময়লা শার্ট ধুয়ে পরার চেয়ে কিনে পরা ইকোনমি। শার্ট ধোয়ার সময় হচ্ছে ছুটির দিন, কিন্তু সেদিন কাজ করলে বেশি পয়সা পাওয়া যায়। তাছাড়া শার্টটা ধোয়ার জন্য এক ডলার দিয়ে ডিটারজেন পাউডার কিনতে হয়। নিচে নেমে ভাড়ার ওয়াশিং মেশিনেও এক ডলার ঢোকাতে হয়। তাছাড়া মেশিনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থেকে কাপড় শুকিয়ে আনতে একঘন্টা সময় নষ্ট হবে।

শার্ট ধোয়া তো দূরের কথা, আজকাল আমি মসলা কিনতে দূরে ইণ্ডিয়ান দোকানেও যায় না। ফ্রজেন খাদ্য খেয়েই থাকি। রান্না করিনা বললেই চলে। তবে ও কাজটা ভালো পারিও না।

দেশে ডাইনিং টেবিলে পায়ের ওপর পা তুলে খেতাম। এখানে তো একগ্লাস পানিও দেবার কেউ নেই। দেশের বাবুগিরি এখানে এলে ছুটে যায়।

এখানে সোনিয়াকে আমি পুরাপুরি ভুলতেও পারিনি। ওর জন্যই তো মদ গিলি। মেয়েটা আমাকে এতোবড় কষ্ট কেন দিলো, মাঝে মাঝে ভাবি। আমি তো ওকে মন-প্রাণ দিয়েই ভালোবাসি, বাসতাম।

আজ মদ খাবো না। কি লাভ অন্যের জন্য নিজেকে শেষ করে তবে এদেশে এলে মনে হয় না, মদ খেলে মানুষের কোন ক্ষতি হয়। এক একজন যেভাবে গ্যালন গ্যালন মদ খায়। "র" ঢকঢক করে গিলে ফেলে।

এদের ক্ষতি হবেই বা কি করে? এরা তো অনেক অনেক পুষ্টিকর খাবার খায়। আমেরিকাতে কত ধরনের ফ্রুট জুস পাওয়া যায় তার ইয়ত্তা নেই। আপেল কামড়ে, আঙ্গুর চিবিয়ে কষ্ট কে করে? খাঁটি জুস পাওয়া যায়। দাম, পানির সমান। আর দুধ, গ্যালন ভরে বিক্রি হয়। এক ডলার দশ বিশ সেন্ট দিলেই কন্টেনারসহ পাওয়া যায়। কলা এতো সস্তা চিন্তাই করা যায় না ক'য়েক সেন্টের কলা একজনের পক্ষে খাওয়াও সম্ভব নয়। ডলারে ৫/৬ ডজন পাওয়া যায়। তাই তো অনেক "মল" (ষ্টোর) ডিপার্টমেন্টাল এ লেখা থাকে, কলা ফ্রি। মাল কিনতে এসে ক্ষুধা অনুভব করলেই এগুলো ফ্রি খাবেন।

তবে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে, যখন শপিং করতে যায়। বিরাট বিরাট দোকান, এ মাথা থেকে ও মাথা। অনেকগুলো

স্টোর। ট্রলি ভরে মাল ঠেলতে ঠেলতে ক্ষিধে পেলে, পাশেই রাখা আছে বিভিন্ন ধরনের খাবার—জুস, ফল, বিয়ার, বিস্কিট যা ইচ্ছে খাও। কাউ টারে এসে সততার সাথে পেমেন্ট দাও।

তবে আমার যে জিনিসটা সবচে' খারাপ লাগে, তা হলো এদেশের লোকেরা খাদ্য নষ্ট করে প্রচুর। এরা দৈনিক যত খাবার ফেলে দেয় (গারভেজ) তা দিয়ে অনায়াসে আফ্রিকার গরীব দেশ-বাঁচতে পারে। হয়তো আমরাও। আপেল, আঙ্গুরে সামান্যতম দাগ হলে গারভেজ করে (ময়লা ফেলার বাক্সে ফেলে দেওয়া)। স্যাণ্ড্ইজ ঘণ্টায় ঘণ্টায় গারভেজ করছে হোটেলগুলো। একটু ঠাণ্ডা হলে নাকি খদ্দের খাবে না।

শুধু কি তাই? একজন বাবু হোটেলে একগাদা আইটেম নিয়ে টেবিল জুড়ে বসবে। প্রত্যেকটা থেকে এক দু'চামচ খাবে। তাও অনেক সময় সব প্লেটে চামচ পড়ে না। খাওয়া শেষ আয়াসী ভঙ্গিতে রুমালে ঠোঁট মোছে দাম সস্তা, গায়ে বাধে না। আর ঐসব খাবারগুলো এঁটো-ঝুটো বলে বেয়ারা ওয়ান টাইম ইউজ প্লেট সহ গারভেজ করে। চোখে দেখলে আমার খুব কষ্ট হয়, কারণ এই পৃথিবীরই একটি দরিদ্র দেশের মানুষ আমরা। বিনা অপরাধে অভিশপ্ত, কপালে দু'বেলা ভাতের ফ্যানও জোটে না। অথচ এদেশে মাখন, ঘি, দুধের ছড়াছড়ি।

এসব ভেবে তো লাভ নেই। রাত ১১ টা বাজে। দাঁড়ানো চাকুরীর শেষটা আজকের মতো শেষ। সপ্তাহের শেষ, চেক পেয়েছি। অবশ্য বাকী দুটো চাকুরী নগদে। নগদ হলে ট্যাক্সের ঝামেলা নেই।

বাজার করতে হবে। ব্যাংকে টাকাটা জমা করতে হবে। চেকের টাকার দরকার নেই। নগদ টাকাই খেয়ে শেষ করতে পারি না। শুধু বাড়ী ভাড়াতেই মার খাই, ন· হলে একটা চাকুরীর পয়সাই সারামাসের খেয়ে বেঁচে যাবে।

বাজারের পাশেই পেমেন্ট বক্সের মতো একটা কম্পুটারাইজড বাক্স। ওটা ব্যাঙ্কের জম দান কেন্দ্র। গিয়ে নির্দিষ্ট বোতাম টিপ দিলেই স্ক্রীনে লেখা ভাসবে, কি চাই।

জমা দেবো লিখলে অমনি ভেসে উঠবে নগদ না চেক ?

আমি খালি Yes/No তে কারসার এনে ENTER প্রেস করি।

একসময় চেকটা ঢোকাতে বলে, ঢুকিয়ে দেই। ওটা থেকেই আমার ডিপোজিট স্লিল প্রিন্ট হয়ে বের হয়ে আসে আবার মনিটরে আসে, তোমার টাকার অংক মিলিয়ে নাও। ঠিক আছে তো ?

তারপর অফ করে চলে আসি, খুব মজার ব্যাপার। চব্বিশ ঘন্টাই যেখানে সেখানে ব্যাংকে ডিপোজিট করার কাজটা চালানো যায়।

বাজার করলাম সামান্য। ট্রলি ঠেলে গাড়ীতে ওঠালাম। গাড়ী ছাড়লাম। সামনে গ্যাস ষ্টেশন (পেট্রোল প্যাম্প)। মনে পড়লো তেল নিতে হবে। গাড়ী নির্দিষ্ট স্থানে পার্ক করলাম। লোক এসে গাড়ীতে হড়হড় করে তেল ঢালতে লাগলো। এখানে কেউ জিজ্ঞেস করে না, ক' লিটার বা গ্যালন তেল নেবেন ? দাম মাত্র এক ডলার। বিশ সেন্ট পার গ্যালন (গ্যালন=সাড়ে চার লিটার প্রায়) অর্থাৎ ১২/১৩ ডলারে গাড়ীর ফুয়েলট্যাংকি ভর্তি হয়ে যায়।

১২ ডলারের তেল নিলাম এই গ্যাস ষ্টেশনে আবার বাড়তি একটা সুবিধা দেওয়া আছে। ১২ ডলার কিংবা তারচে, বেশি তেল নিলে গাড়ী ফ্রি ওয়াশ করে দেয়।

ঢুকিয়ে দিলাম গাড়ী ধোলাই কক্ষে। এখানেও সব কম্পিউটারের ব্যাপার স্যাপার। আমি গাড়ীর ভেতরেই জানালা বন্ধ করে বসলাম। মাত্র দশ মিনিট। চারপাশ থেকে পানির ফোয়ারা গাড়ীটাকে ঘিরে ফেললো। হুড়হুড় করে ধোলাই করলো। সঙ্গে সঙ্গে অন্য মেশিন এসে ক' মিনিটেই গাড়ীটা মুছে দিলো। তারপর সামনে সবুজ সিগন্যাল দিলো—অর্থাৎ গাড়ী ধোলাই শেষ।

ঘরে আসার সময়ই মনে যতো কষ্ট, রান্না করতে হবে ফ্রজেন জিনিসগুলোকে শুধু পানিতে ফোটানো। স্বাধ গন্ধ ঝাল সব আমাদের দেশের মাপ মতো নেই বললেই চলে, হালকা। এসব খাবারের হাতেই আমি বন্দী। শুধু আমি কেন? সব বাঙ্গালীরাই।

বেশিরভাগ সময়ই সুন্দর কন্টেনারে ভরা গ্যালন দুধে চুমুক দিয়ে যা পারি খাই, তারপর শুয়ে পড়ি। খাঁটি দুধ খেলেও ফ্যাট ছাড়া খাই। ইদানিং লক্ষ্য করছি, ভুড়িটা আমা স্বাস্থ্যবান হচ্ছে। দেশে থাকতে মনে হতো, প্যান্ট বুঝি কোমর ছেড়ে নেমে পালাই পালাই করছে। মনে আশা ছিলো, কবে পেটটা ফুলবে, প্যা টটা তাহলে মানানসই হতো। কিন্তু এখন পেটকে টাইট বেল্ট দিয়ে আটকে রাখতে হয়। মাঝে মাঝে বাঁচে দৌড় দিয়ে ওটাকে কন্ট্রোলে রাখতে হয়। ওটা বড় বেয়াড়া, একবার বাড়তে আরম্ভ করলে, সহজে নিয়ন্ত্রিত হতে চায় না।

ঘরে এসে মেইল-বক্স খুললাম। খুব পরিচিত মেয়েলি হাতের লেখা চিঠি। মুক্তোর মতো ঝরঝরে প্রতিটি অক্ষর। নীপাভাবী ঠিকানা লেখার বেলায় বিশেষ যত্নবান।

ভাবীর চিঠি এলে খুব ভালো লাগে। এখানে শত ব্যস্ততার মধ্যে চিঠি লিখতে ভালো লাগে না, কিন্তু পড়তে খুব ভালো লাগে। চিঠির মাঝে সুদূরে হারিয়ে যাওয়া দেশকে একেবারে কাছে পাওয়া যায়।

ভাই শিমু,

"আশা করি ভালো আছো। আমার আশীর্বাদ তো তোমার সাথেই আছে। ভালো থেকো পড়াশুনা কমতো করবে এবং খাওয়া দাওয়া। স্বাস্থ্যের যত্ন নিতেই হবে তোমাকে।"

ভাবী এবারের চিঠিতে একটা ব্যতিক্রমী শব্দ লিখেছে—"আশীর্বাদ" এর আগে সব চিঠিতে ভালোবাসা লিখতো। রহস্যটা কোথায় (?) বুঝতে পারলাম না। আবারও চিঠি পড়তে লাগলাম!

"আমি ভালো। মা মাঝে মাঝে তোমার জন্য কান্নাকাটি করলেও তিনি সুস্থ। বাড়ীর সকলে ভালো। আব্বা মাঝে মাঝে তোমার কথা বলেন। তোমার ভাইয়া আগের মতোই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। অবশ্য আব্বা তোমার ভাইয়াকে নিয়ে গর্ব করেন মাঝে মাঝে তার লেখা আর্টিকেল আমাকেও পড়ে শোনান।"

এখানেও দুটো ব্যাপার আমার মনে দোলা দিলো—এক নম্বর মায়ের কান্না। দুই নম্বর রকিব ভাইয়ার প্রতি ভাবীর ব্যবহৃত ভাষা যেন কেমন—'তোমার ভাইয়া' শব্দটা মনে দাগ কাটলো।

তাহলে কি তুর ছাই এসব কি ভাবছি? হলে তো হতেও পারে। নীপাভাবী এখনও আপন। আর ভাইয়ার তো প্রেমে পড়া পুরনো অভ্যাস। যদি হয় তাহলে মন্দ কি? আবারও চিঠিতে মন দিলাম।

"আমি তোমার ওখানে বেড়াতে যাবো। এদিককার সব কাগজ-পত্র প্রায় পাকাপাকি। তোমাকে সারপ্রাইজ দেবো বলে কিছু লিখিনি আগে। তুমি শুনলে আরো আশ্চর্য হবে, আমার ভিসা হয়ে গেছে। এখন আমার ইচ্ছা মতো রওয়ানা হতে পারবো। তবে খুব যলদি করার কোন কারণ নেই তুমিই বরং জানাবে কবে নাগাদ আমি যাবো?

তোমার জন্য মসলা গুঁড়ো, পোলাউ'র চাল, পিঠা নিয়ে যাবো। জানি খাদ্যদ্রব্য আটকাবে, সে দেখা যাবে। খাদ্য দ্রব্যের ভয়ে এবং কনকর্ড বিমানের বেশি ভাড়ার জন্য লণ্ডন হয়ে ব্রিটিশ এয়ার লাইনে সরাসরি যাবো না। থাই এয়ারে ব্যাংকক হয়ে যাবো। একরাত ব্যাংককে থাকাও যাবে। ভাড়াও কম। তুমি তো ফ্লোরিডাতে আছো। আমি ডাল্লাস হয়ে ওয়েষ্ট-পামে নামবো না-কি মিয়ামীতে নামলে তোমার সুবিধা হবে? জানাবে।

আমি ফোনে আমার যাওয়ার তারিখ জানাবো। তবে তার আগে তুমি তোমার সুবিধা জানাবে। ক'টা গানের ক্যাসেটও নিয়ে যাবো। বাংলাদেশী ব্যাণ্ড কার কার আনবো? 'সাজান' এর বাংলা ক্যাসেট বের হয়েছে, নেব? তোমার জন্য যদি অল্প পয়সাতে আরো কিছু আনা সম্ভব হয়, তাহলে জানাবে।"

লাফ দিয়ে উঠলাম। নিপাভাবী করেছে কি? অসাধ্য সাধন করেছে। ভিসা পেয়েছে? আসছে। খুশিতে চিৎকার করে উঠতে মন চাইলো।

এখনি ফোন করবো। ভাবী নিশ্চয়ই প্লেন ফেয়ারের জন্য দেরি করার কথা ভাবছে। আমি কালই ক্রেডিট কার্ড চার্জ করবো, এয়ার টিকিট কিনে পাঠিয়ে দেবো। আমার তো সিটি ব্যাঙ্কের হাইফাই ক্রেডিট কার্ড আছে, গোল্ড কার্ড। বহু কষ্টে। ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা বলে জোগাড় করেছি। এখন আমার জন্য বিশ্বের কোথাও টাকা ফোন সমস্যা নয়। যে কোন থেকে খুশি চার্জ করা যায়।

খুশিতে মদের বোতলটা ফ্রিজ থেকে বের করলাম। চুমুক দিলাম। ক'দিন পর তো ঘরে আর এগুলো খাওয়া যাবে না। সব খালি বোতল ফেলে দিতে হবে। নাহয় ভাবী ভীষণ কষ্ট পাবে। হয়তো সে'রাতের মতো থাপ্পড় কষাবে।

ভাবী আসলে কি করবো। কোথায় কোথায় নিয়ে যাবো? ভাবী কি কি রান্না করবে? কি মজা হবে। ভাবীও চাকুরি করবে। ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে একসময় সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

চৌদ্দ

'স্যার, আপনার কাছে দু'জন মহিলা গেষ্ট এসেছেন নীচে ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করছেন বেয়ারা এসে জানালো রকিবকে।

রকিব মদ খেয়ে ঢোল হয়ে এ্যামবাসেডর হোটেলের একটা রুমে শুয়ে। সামনে তখনও খালি বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে। রাগ দুঃখ দুদিনে অনেকখানি কমেছে। তবুও পুরোপুরি কাটেনি। বেয়ারার কথাই ও মোটেই আশ্চর্য হলো না। কে বা কারা ওর কাছে আসতে পারে, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামালো না সোজাসুজি বলে দিলো, 'তুমি ভুল করেছো। আমার কাছে কেউ আসতে পারে না। কারণ আমি যে তোমাদের হোটেলে সেটা আমি ছাড়া কেউ জানে না।'

বেয়ারা চলে গেলো। নীপা এবং সোনিয়াকে জানালো।

'চলো ভাবী, আমরা ওপরে যাবো।'

'কিন্তু ।' বেয়ারা ইতস্তত করলো।

'ইনি আমার ভাবী।' সোনিয়া বললো, 'ভাইয়া রাগ করে বাড়ি থেকে চলে এসেছে। তাই ভাইয়াকে নিতে এসেছে। আপনি বরং আমাদেরকে রুমটা দেখিয়ে দিন। ভাবী ভেতরে গিয়ে ভাইয়াকে বোঝাবে। আমি আর আপনি বাইরে অপেক্ষা করবো। চলুন।'

তাড়া খেয়ে বেয়ারা সামনে কাউন্টারে বসা ম্যানেজারের দিকে তাকালো। ম্যানেজার মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালো।

এক প্রকার ধাক্কা দিয়েই ভাবীকে রুমে ঢুকিয়ে দিলো সোনিয়া। নিজেও উঁকি দিয়ে দেখে নিলো, রকিব ভাইয়াই তো?

'রকিব।' নিপা এই প্রথম এমন করে সম্বোধন করলো রকিবকে।

'কে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো, তুমি।'

'তোমাকে নিতে এসেছি।'

'কাজটা ভালো করো নি।'

'আমি চাকুরিতে জয়েন করি নি।'

রকিব সোজা হয়ে বসলো। নীপার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে রইলো। নিপাকে যেন কখনও দেখেনি বোধহয় ওকে বুঝতে চেষ্টা করলো।

নিপা ঝাপাৎ করে রকিবের পায়ের কাছে বসে পড়লো। ওর পায়ে হাত রাখলো। 'রকিব আমাকে ক্ষমা করো, আমি সে রাতের ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত। আমি ভুল করেছি, তোমার কথা শোনা উচিত ছিলো।'

'ছিঃ নিপা ওঠো রকিব নিপাকে দু'বাহু ধরে তুলে বুকে টেনে নিলো 'নিপা, আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। আমাকে তুমি রক্ষা করো।'

'এ ভুল তুমি কেন করলে রকিব।' রকিবের বুকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো নিপা। 'আমি তো বিধবা। আমি তো কুমারী

নই। তোমার জীবনটা সুন্দর। তুমি আমার সাথে নিজেকে জড়িয়ো না। মা বাবা দুঃখ পাবেন। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ, তারা আমাকেও ভুল বুঝবেন।'

'ভুল তো অনেক আগেই করে ফেলেছি, নিপা। এখন তো আমার ফেরার কোন পথ নেই। আমি যে তোমাকে ঘিরে অনেক বেশি ভেবে ফেলেছি।'

'বাবা-মাকে কষ্ট দিও না রকিব। বড় ছেলে হিসেবে তা তোমার উচিত হবে না।'

'আমি তো আগেই বলেছি, আমার আর ফিরে আসা সম্ভব নয়।

'বাবা মা কষ্ট পাবেন।'

'তুমি কষ্ট পাবে না নিপা?'

নীপা মাথা নত করে রাখলো। ওর কান্না আরো বেড়ে গেলো। মুখ দিয়ে একটা শব্দও বের হলো না।

'নীপা চুপ করে থেকো না। তুমি বলো, তুমি কি আমাকে একটুও ভালোবাস না?' নীপার দু'বাহু ধরে ঝাঁকি দিলো রকিব।

'বলো নীপা, আজ তোমাকে বলতেই হবে।'

'জানি না।'

'কিছুতেই তুমি এড়িয়ে যেতে পারবে না নীপা। আজ তোমাকে চূড়ান্ত করতেই হবে। আমি আর নিজের সাথে যুদ্ধ করতে পারবো না। এই দুদিনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আজ তোমাকে স্পষ্ট করেই বলতে হবে যা বলার। আমাকে ভালো না বাসলেও বলতে হবে।'

নীপার মাথায় হাত রাখলো ও। 'আজ যদি তুমি আমাকে খোলাখুলি প্রত্যাখ্যান করো। তাহলে এই তোমার মাথা ছুঁয়ে শপথ করছি, জীবনে কখনও তোমার দিকে হাত বাড়াবো না, তাতে আমার কষ্ট যতই হোক না কেন?'

নীপা রকিবের কথার কোন উত্তর দিলো না। মুখটা একটু তুললো। অশ্রুমাখা ডাগর ডাগর চোখে বারেকের জন্য রকিবের দিকে তাকালো।

'বলো নীপা, তুমি কি আমাকে একটুও মনে স্থান দাও নি? তুমি কি আমার ভালোবাসা একটুও পড়তে পারোনি? তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না?'

'তুমি বোঝনা -' নীপা ভাঙ্গাভাঙ্গা কণ্ঠে কথাটা বলে অঝোরে অশ্রু ঝরাতে লাগলো।

'নীপা, আমার নীপা।' দু'হাতে আঁকড়ে ধরলো ওকে রকিব। সবটুকু শক্তি দিয়ে চেপে রাখলো নিজের বুকের সাথে। 'আর কিছুই শুনতে চাই না আমি। এরচে' বেশি কিছুই আশা করি না আমি।'

'খুক, খুক, খুক। দরজা কিন্তু খোলা।' উঁকি দিয়ে খিলখিল করে হাসতে লাগলো সোনিয়া।

ওরা দু'জন—রকিব আর নীপা, দুজন দুজনকে ছেড়ে বিদ্যুতের মতো ছিটকে সরে গেলে।

'বাঁদর মেয়ে কোথাকার।' রকিব হাসলো।

'বারে, আমাকে গালাগাল দিচ্ছো কেন? দরজা লাগাতে নিজেদের হুশ থাকে না? এখন সব দোষ আমার না?'

'ঐ ছেমড়ি' রকিব এগিয়ে এসে সোনিয়ার কানে ধরলো, 'আমি বুঝি তোদের কথা কিছু জানি না মনে করেছিস না ? শিমুল কেন দেশ থেকে পালিয়ে গেলো, কিচ্ছু বুঝি না মনে করেছিস না ? আমি সব জানি।'

'ভাইয়া ছাড়ো।'

রকিব ছাড়লো।

'তুমি জানো কচুটা।' ভেংচি কাটলো সোনিয়া।

'তুই শিমুলের সঙ্গে

'ভাবী, কিছু বলবে ভাইয়াকে

'কি আরম্ভ করলে তুমি বাচ্চা মেয়েটার সাথে ? শুধু শুধু ওকে লজ্জা দিচ্ছো।'

'ওরে বাবা মাথায় হাত তুলে দিলো সোনিয়া। চোখ বড় বড় করে বললো, 'এইটুকু সময়ের মধ্যেই তোমরা এতোদূর এগিয়ে গেছো ? একেবারে তুমি পর্যন্ত ?'

'পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে, হু। বুঝলি ?' রকিবও ইয়ার্কি করলো

সোনিয়ার পায়ে ঠেকলো মদের শুন্য বোতলটা। 'ভাইয়া অনেক কষ্ট করে খুঁজে তোমাদের মিল করিয়ে দিলাম। জীবনে আর কখনও ঐ বোতলটা ছুঁতে পারবে না কিন্তু, বলে রাখলাম।'

'তোর ভাবীর ওপর তা নির্ভর করবে।'

'মানে ?' সোনিয়া জিজ্ঞেস করলো।

'তোর ভাবী যদি, কখনও কষ্ট না দেয়, তাহলে কোন দুঃখে ঐ বাজে জিনিসটা স্পর্শ করব ?'

'ভাবী আমার, তেমন মেয়েই নয়।'

'খুব তো ভাবীর হয়ে সুপারিশ করা হচ্ছে। ঘুষ কত দিয়েছে?'

'এখনও দিই নি। তবে সিমুলকেই ঘুষ হিসেবে ওর গলায় ঝোলাবো।' নীপা সোনিয়ার গাল ধরে টিপে দিলো।

'ভাবী—ইস্ ছাড়ো না।'

ওরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। রকিবের কণ্ঠের জোর একটু বেশিই মনে হলো। রকিব হাসতে হাসতে নিজের কাপড় গোছাতে লাগলো।

'এই, কি করো?' নীপা রকিবের কাপড় গোছানো দেখে বললো, 'কাপড় গোছাচ্ছো কেন?'

'তোমাদের সাথে যাবো আমি।'

'না।'

'না কেন?'

নীপা চোখ বড় বড় করে বললো, 'তুমি যাবে আমাদের সাথে, তারপর মা দেখুক আর কি। মা কি ভাববেন? তা হবে না। তুমি বরং পরে যাও। আমরা আগে চলে যাই।'

'মা জানবে, এই ভয়?' হা লো রকিব, 'এতে লজ্জার কি আছে? মা তো একদিন জানবেই। তখন?'

সে জানুক।'

'আমি গিয়েই মাকে সরাসরি প্রস্তাব করবো।'

'ছিঃ কি লজ্জা!' আঁচল দাঁতে কামড়ালো নিপা।

'মা খুশী হবেন। মা তোমাকে ভীষণ ভালো জানেন।'

'আশ্রয়টুকু শেষ পর্যন্ত বুঝি হারাতে হচ্ছে।'

'মোটেই না। বরং পোক্ত হচ্ছে।'

'তুমি কিছু ভেবো না ভাবী, সোজা আমাদের বাসায় চলে আসবে। আমার সাথে থাকবে।' সোনিয়া ভাবীরে হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললো, 'তোমাকে সাথী পেলে যা মজা হবে।'

'তুই তো বড় জোর আর পনের দিন। তারপরই তো ভোঁ।'

ভোঁ মানে রকিব বুঝলো না।

'ওহ্ তোমাকে তো বলা হয় নি। সোনিয়ার কাগজপত্র সব ঠিক। সোনিয়াকে আমি শিমুলের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছ।

'শিমুল জানে?' যেন আৎকে উঠলো রকিব। 'শিমু কি সম্মতি দিয়েছে?' শিমুলের মনোভাব রকিব জানে। তাছাড়া খুব ছোট থেকেই শিমুল একগুঁয়ে, একথা রকিবের চেয়ে বেশি কে-ই বা জানে ওরা শুধু ভাই নয়, বন্ধুও বটে একে অপরের

'শিমুলকে সার প্রাইজ দেবো। শিমুল জানবে আমি ওর কাছে বেড়াতে যাচ্ছি। ও ঠিক মতো পোর্টে আসবে। ওখানে এসে ও আশ্চর্য হবে। আমার বদলে পোর্ট থেকে বের হয়ে আসবে সোনিয়া।' মুচকি হাসলো নিপা, 'ব্যাপারটা কেমন হবে? খুব থ্রিলিং না?'

নিপা এবং সোনিয়া দু'জনেই আশা করেছিলো, রকিবও হাসিতে ওদের সাথে যোগ দেবে। ব্যাপারটা ওর কাছেও মজার হবে। কিন্তু ওরা চুপসে গেলো অজানা ভয়ে। রকিব একটুও হাসলো না, বরং ওর মুখটা অনেক বেশি গম্ভীর হয়ে গেলো। কালো ছোপ পড়লো। কপালে ভাঁজ ফেলে সিরিয়াস কিছু ভাবার চেষ্টা করছে বলেই মনে হলো।

'কি হলো?' নিপা তাড়া দিলো।

'ব্যাপারটা তোমার সিরিয়াসভাবে ভেবে করা উচিত ছিলো। শিমুল সোনিয়াকে কি ভাবে বর্তমানে সেটা বুঝে, তারপর এমন সিদ্ধান্ত নিলে পারতে।'

'মানে...।'

রকিব সোনিয়ার দিকে তাকালো। মুহূর্তেই হাসিখুশি মেয়েটার মুখে কে যেন এক পোচ কালি মাখিয়ে দিয়েছে। নার্ভাসনেস ফুটে উঠেছে।

'ঠিক আছে, যা প্লান করেছো, তাই নাহয় হবে।'

'ভাইয়া...' সোনিয়ার চোখ ছলছলে।

'ধুর পাগলী।' রকিব ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো, 'নার্ভাস হওয়ার কিছু নেই, শিমুল তো তোকে একা ফেলে পোর্ট থেকে পালাতে পারবে না।'

'ঠিক তাই, আমিও তাই ভেবেছি।' নিপা বললো, 'শিমুল আর ও মিলে ওদের ভুল বোঝাবুঝি তখন শেষ করে ফেলবে।

'কিন্তু ও যদি...'সোনিয়া আমতা আমতা করতে লাগলো।'

'চুপ।' নিপা ধমকে উঠলো সোনিয়াকে। 'শিমুল জানি তা করবে না, তাহলে তুই সোজা হোষ্টেলে চলে যাবি। তুই তো ওখানে পড়তে যাচ্ছিস। ওখানে তোর থাকার জায়গা স্কুল কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই করে রেখেছে। যাবার আগে স্কুলে একটা কল দিয়ে যাবি।'

ক তাই।' সোনিয়াকে বললো রকিব। 'সময়ই সব বলে দেবে কি করতে হবে। এখন বরং এ পৃষ্ঠা ওল্টাও।'

'ইটস্ এ গুড আইডিয়া।' নিপা সোনিয়ার হাত ধরে টানলো, তারপর রকিবকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'আমরা চললাম, তুমি সময় মতো চলে এসো কিন্তু। মাকে আবার বলো না যে, আমরা এসেছিলাম এখানে।'

'নিশ্চয়ই না।' হাসলো রকিব। এবং সোনিয়ার অগোচরে নিপাকে চোখ মারলো।

নিপা মুচকি হেসে বললো, 'বাঁদর একটা।'

পনের

আমি এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে। নিপা ভাবী আসছে। আজ খুব সজ্‌ছি আমি। একেবারে আমেরিকানদের মতো করে। জিন্সের প্যান্ট। ব্যাগল বয় কালো শার্ট। পায়ে র‍্যাবন কেডস্‌, চোখেও র‍্যাবন কালো চশমা। চশমার গ্লাস ডে এণ্ড নাইট। কোমরে ওয়াকম্যান। হাতে আরমিটন কোয়াজ ঘড়ি। আঙুলে ডায়মণ্ড বসানো আংটি।

নির্ঘাৎ ভাবী আমাকে দেখলে চিনবেই না প্রথমে। আমার এই পরিবর্তনে খুব খুশি হবে। দু'হাজার ডলার দিয়ে একটা মাজদা গাড়ীও কিনেছি। যদিও নগদে নয়, ক্রেডিট কার্ড চার্জ করেছি। আমার এসবই ভাবীকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য।

একবার ভেবেছিলাম রেন্টকার নেবো। ভাবীকে নিয়ে সারা শহর ঘুরে ঘরে যাবে। পরে ভেবেছি, না, ভাবীতো দীর্ঘ সময় জার্নি করে আসছে, ক্লান্ত। প্রথমেই তার যা দরকার তা হচ্ছে বিশ্রাম। প্লেনের এমন লম্বা জার্নি ভাবীতো এমনিতেই অভ্যস্ত নয়। প্লেন জার্নি ভীষণ খারাপ। আটলান্টিকের ওপর দিয়ে যখন ওড়, তখন বুকের ভেতর পর্যন্ত শুকিয়ে যায়।

রাত ১১ টা। সমস্ত ওয়েষ্টপাম পোর্টটা আলোয় আলোকিত।

ভাবী থাই এয়ারে উঠেছে, অর্থাৎ কানেকটিং ফ্লাইট হবে ডেলটা এয়ার লাইন। ওটা রাত ১২ টার সময় এখানে ল্যাণ্ড করবে।

গাড়ীতে বসে অপেক্ষা করতে পারতাম। গান শুনে সময় কাটাতে পারতাম। গাড়ীতে আশেকি, দিল এবং সাজান'র ক্যাসেট আছে। বাংলাটা। শুনতে খুব ভালো লাগে। গানটা শুনলে আমি কেমন জানি হয়ে যাই। মনটা বাতাসে ভাসতে শুরু করে।

এ দুনিয়া পারি ভুলতে
তোমায় পেলে যে,
যে দিনক্ষণ দেখে না, বোঝে না
শোনে না যেমনকে ভরে তুলতে।
থাকে ফুল ফোটে
কলি যায় ছোটে
সে চায় যে শুধু দুলতে
পাখনা মেলে যে॥
তুমি আছো, জানি দু'চোখে
ভরে আছো শুধু এই মন
চিরদিনই যেন থাকে দুজনেরই
এই বন্ধন, মিলেছে দুটি জীবনে
মিলেছি দুটি জীবনে
হায় জ্বালা পারি জ্বলতে
তোমায় পেলে যে॥
সুখে দুখে তুমি আমি

রব একই বাসাতে
ভরে দেবো দুটি হিয়া
শুধু ভালোবাসাতে
জীবনে শুধু যে তুমি
হায় সব যে পারি
ভুলতে, তোমায় পেলে যে।

কিন্তু এখন গাড়ীতে বন্দী থেকে নিপাভাবীর জন্য অপেক্ষা করতে একটুও মন চাইছে না

শুধু ব্যস্ততা, কখন আসবে ভাবী? প্লেনটা কি পারে না আরো দ্রুত ছুটে এসে ছোঁ মেরে আমার নীপা ভাবীকে নামিয়ে দিতে?

হাতের ঘড়িও যেন আমার সাথে মশকরা করছে, একটুও নড়তে চাইছে না। অহেতুক ঘড়িটার বটম নিয়ে ঘোড়ালাম। এক ঘণ্টা পর এ্যালারম্ দিয়ে রাখলাম। ঠিক এক ঘন্টা পরে অর্থাৎ বারোটার সময় ওটা টু টু করে প্রথমে আটবার পরে আবার আটবার বেজে উঠবে। আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে, নিপাভাবী এসেছে। কেন ঘড়িটাতে ঘন্টি দিয়ে রাখলাম, জানি না। কারণ, আমি ভালো করেই জানি, প্রতি মিনিটে কম পক্ষে পাঁচবার আমার চোখ ঘড়িতে পড়বেই।

শুধু কি তাই? চাকুরিস্থলে ছুটিও নিয়েছি। তিনদিনের ছুটি। পরে আরো বাড়াবো এমন কথাও সুপারভাইজারকে বলে এসেছি। এই ক'দিন নিপাভাবীকে নিয়ে শুধু ঘুরবো। মিয়ামী যাবো। বীচে যাবো, ডেলরী বীচে বেড়াবো। ছুটি যদি বাড়াতে পারি তাহলে সোজা ডিজনিল্যাণ্ডে ফ্লাই করবো। ডিজনিল্যাণ্ড চমৎকার দেখার জায়গা শুনেছি, কিন্তু কখনও দেখিনি।

কি মজাই না হবে। নিপাভাবীকে আর যেতে দেব না। থাকবে এখানেই। তার তো বুড়ো স্বামী মরেছে। এখন তার কোন পিছু-টান নেই, যেমন আমার।

পিছুটান আমার হয়তো থাকতে পারতো, কিন্তু আজ নেই। আই হেট হার। সোনিয়া আমার জীবনে শুধু স্মৃতি মাত্র। সোনিয়া আমার জীবনের একটি অতীত অধ্যায়, যার কোন বর্ত্তমান নেই। ছেঁড়া সুতো। যার নাগাল কিছুতেই পাওয়া সম্ভব নয়, গ্যাস ভরা বেলুনের মতো, সুতো ছিঁড়লে আর ধরে রাখা যায় না, ফিরিয়ে আনাও অসম্ভব।

এসব আমি কি ভাবছি? ছিঃ আমি তো ওকে ভাবতে চাই না। যে আমাকে ভুলেছে, তাকে তো আমার ভুলতেই হবে। খুব ইচ্ছা হলো, দোকানে দাঁড়িয়ে একটা "বিয়ার" খেতে। ওর কথা মনে পড়লে আমি এমনটিই করি। কিন্তু না, এখন খাবো না। নিপা-ভাবী খারাপ ভাববে। যদিও ক'দিন পর দেখতে দেখতে তারও সয়ে যাবে, হয়তো একদিন সেও খাবে।

একসময় ঘড়ির দিকে তাকাতেও ভুলে গেলাম। প্লেনের শব্দে আনমনা হয়ে উঠলাম। একটা যন্ত্র দানব এসে মাথার ওপর চক্কর কাটছে। পোর্টের ক্লিয়ারেন্স পাচ্ছে না বোধহয়। খুব খুশি লাগলো, মুখে হাসি ফুটে উঠলো, ওটার ভেতরেই রয়েছে আমার নিপা-ভাবী।

বারোটা বাজতে মাত্র তিন মিনিট বাকী। নামছে যন্ত্র দানবটা। একছুটে ওটা রানওয়ের ওপর দিয়ে পোর্টের কাছাকাছি আসছে। এখানে প্লেনে সিঁড়ি লাগাতে হয় না, সোজাসুজি এয়ারপোর্টের বিল্ডিংএ নামা যায়।

আমি অপেক্ষা করছি। কাষ্টম পার হয়ে একের পর এক যাত্রী বের হয়ে আসছে। ঝালেমার আসল কাষ্টম ডাল্লাস' এ হয়ে গেছে। অনেকের হাতেই শীতবস্ত্র, এরা এখানে নতুন। এদের ধারণা ছিলো, এখানেও হয়তো ন্যুয়র্ক এর মতো শীত। কিন্তু তা ঠিক নয়, এখন এখানকার আবহাওয়া একেবারে বাংলাদেশের মতো। তবে এখানে কোন রকম ধূলো বালি নেই। এই জন্য কাপড়ও ময়লা হতে সময় লাগে।

অনেক যাত্রী নেমে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে। তাদের কত আত্মীয় স্বজন রিসিভ করছে, কোলাকুলি করছে। কিন্তু নিপাভাবী আসছে না কেন? তাহলে কি আসে নাই? বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করতে লাগলো। চোখ অস্থির প্রতিটা যাত্রীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ ঘুরে ফিরছে। এদের কারো সঙ্গেই নিপাভাবীকে মেলাতে পারছি না।

একজন এগিয়ে আসছে, এই মেয়েটাই বুঝি প্রথম বাঙ্গালী যাত্রী। সালোয়ার কামিজ পরেছে। চোখে সানগ্লাস কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো। দু হাতে ট্রেলি ঠেলে আনছে, দুটো বড় ব্যাগ। লম্বা অনেকটা নিপা ভাবীর মতো হলেও, দূর থেকেও কনফার্ম হলাম, ও নিপাভাবী নয়। তবুও চোখ তুলে মেয়েটার মুখের ওপর চোখ স্থির করলাম। মেয়েটা এগিয়ে আসছে। ক্রমে ক্রমে ওর আর আমার দূরত্ব কমছে।

কে ও!

ও কে!

চোখ ডললাম। নিজের দামী র‍্যাবন সানগ্লাসটা চোখ থেকে নামালাম ভালো করে দেখছি।

সত্যি কি ও!

ও কি!

হ্যাঁ। সেই চলার ভঙ্গি। সেই মিষ্টি চেহারা। সেই ডাগর দুটো চোখ। সেই আকর্ষনীয় গাত্রবর্ণ। সেই পাতলা গোলাপী ঠোঁট।

মেয়েটাও ওর পরিচিত জনকে খুঁজছে। চারপাশে চোখ ঘোরাচ্ছে। ট্রলি ঠেলে প্রায় আমার পাশে এসে থমকে দাঁড়ালো। আমি সানগ্লাসের ভেতর দিয়ে সরাসরি ওর মুখের দিকে বারেকের জন্য তাকিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম।

আর কোন সন্দেহই রইলো না।

মেয়েটা সোনিয়া।

ও হয়তো এসেছে। হয়তো কারো কাছে। আমার কি? আমেরিকাটা তো আমার বাপের নয়. যে কেউ এখানে আসতে পারে। কিন্তু মেয়েটা বোধহয় আমাকে চিনতে পারে নি। আমাকে ও কখনও এমন পোশাকে দেখেনি তো। তাছাড়া আমি এখানে আসার পর যথেষ্ট মোটা হয়েছি, গায়ের রংও ফর্সা হয়েছে অনেক। চেনার কোন উপায়ই নেই, অথবা চেনা কষ্টকর।

সোনিয়া আমার বাম পাশে এসে দাঁড়ালো। আমাকে ভালো করে দেখছে। আমি বুঝতে পারছি—আমি শিমুল কি না ওর সন্দেহ এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। আমি ওর দিকে ফিরলাম না। চিনতে

পেরেও না চেনার ভান করলাম। চেনার দরকারই বা কি? আমি তো আর ওর জন্য অপেক্ষা করছি না। ও যার কাছে এসেছে, যাক না তার কাছে।

মাথায় আমার হাজারও চিন্তা তখন ঘুরপাক খাচ্ছে। ও কিভাবে এলো? কার কাছে এসেছে সঙ্গে কাউকে তো দেখছি না, এমনও তো হতে পারে, ও ওর স্বামীর সঙ্গে এসেছে। হয়তো বিয়ে হয়ে গেছে। এমন তো এখানে কতই হচ্ছে, দেশে গিয়ে কত ছেলেই তো বিয়ে করে ফিরছে হয়তো স্বামীর কা মস দেরি হচ্ছে, ওর হয়ে গেছে, তাইও বর হয়ে এসেছে।

তাছাড়া ও আমার কে? ও তো আর আমার কেউ নয় হঠাৎ মাথায় অন্যরকম চিন্তা ঢুকলো নিপাভাবী কোথায়? ঠিক এই ফ্লাইটেই নিপাভাবীর আসার কথা, যার জন্য আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

তাহলে কি সবই নিপাভাবীর চালাকি? নিপাভাবী ফাঁদ রচনা করেছিলো? তাহলে তার নয়, আসার কথা ছিলো সোনিয়ার? আমার সঙ্গে ভাবী ধাপ্পাবাজী করেছে?

আড় চোখে সোনিয়ার পায়ের নীচে তাকালাম। লাল স্যাণ্ডেল, বাটা কোম্পানীর হবে হয়তো। এমন স্যাণ্ডেল দেশের মেয়েদের পায়ে বহু দেখেছি। স্যাণ্ডেল পরা পা টা একটুও নড়ছে না। ঠাই হয়ে দাঁড়িয়ে—মানে, সোনিয়া তখনও আমার পাশে স্থির। তাহলে কি আমাকে চিনতে পেরেছে ও?

আমি একটু সরে দাঁড়াবার প্লান করলাম। তবে এখনই চলে যাবো না। শেষ যাত্রীটা পর্যন্ত দেখবো। ইচ্ছেটা এমনই।

'শিমুল।'

দু'পা সামনে বাড়িয়েছি, অমনি পেছন থেকে ডাক পড়লো। কণ্ঠটা আমার পরিচিত, একেবারে মনের গভীরে গাঁথা। অনেক বেশি পরিচিত। কণ্ঠটা সোনিয়ার।

'শিমুল।' আবারও ডাকলো সোনিয়া।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ইচ্ছা অমনটি ছিলো না। দৌড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করলেও, বুঝি এখন আমার পা তা পারে না। ঐ কণ্ঠস্বর যেন আমাকে চুম্বকের মতো আটকে ফেললো। মুখ অন্য দিকে ফিরিয়েই দাঁড়িয়ে রইলাম। পিছনের পদশব্দে বুঝলাম—ও এগিয়ে আসছে

'শিমুল, আমি তোমার কাছে এসেছি।'

'প্রশ্নই আসে না।'

'আমি ক্লান্ত।'

'স্বাভাবিক।'

'আমাকে নিয়ে চলো।'

'কোথায়?'

'তোমার বাসায়।'

'আমার কোন বাসা নেই।'

'তুমি যেখানে থাকো সেখানে নিয়ে চলো।'

'আই হেট ইউ।'

কথাটা শুনে বোধহয় থমকে গেলো মেয়েটা। এতোক্ষণ যে গতিতে কথা বলছিলো, তা হঠাৎ করেই থেমে গেলো।

'শিমু।' কণ্ঠে মিনতি।

আমি চুপ। ভাবছি– কথাটা বলা কি উচিত হয়েছে? হয়তো না। না, ঠিকই বলেছি, যা সত্য তাই বলেছি —আই হেট হার।

'আমি আমার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইতে এসেছি তোমার কাছে।'

'ক্ষমা চাওয়া হয়েছে?'

সোনিয়া চুপ। জানি ওর চোখে পানি।

'ক্ষমা চাওয়া শেষ হলে যাও, তুমি তোমার পথে যাও। আমি ব্যস্ত, আমার কাজ আছে।'

'তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করছো।'

'মিথ্যে কথা।'

'নিপা ভাবী আসবে না।'

'কে আসবে, না আসবে, সে সব কথা তোমার মুখ থেকে শোনার জন্য আমি এখানে দাঁড়িয়ে নেই।'

'আমি তোমার কাছে এসেছি।'

'কথাটা আগেও একবার বলেছো।'

'তুমি কেন জবাব দাও নি।'

'জবাব দেবার কিছুই নেই।'

'পারো না সব অতীত ভুলতে।'

'আমার কোন অতীত নেই।' চিৎকার করে উঠলাম। 'উড ইউ প্লিজ গেট আউট।'

'শিমুল!' সোনিয়ার কণ্ঠের কান্না আর উত্তেজনা একাকার হয়ে ভল্যুয়ম বেড়ে গেলো, 'আমি সুদূর বাংলাদেশ থেকে এসেছি, এবং

তোমারই কাছে। আমাকে এভাবে দুর ছি করার কোন মানে হয় না। তুমি একটা অভদ্র, সাধারণ মানবিক দিকগুলোও তোমার মরে গেছে···।'

'হ্যাঁ মরে গেছে।' ওর কথার সুত্র ধরে বললাম, 'আমি নিজেও মরে গেছি। ইট'স এ ডেড বডি। হোয়াট কুড ইউ এক্সপেক্ট ফ্রম এ ডেড ম্যান? আণ্ড ইউ, হুউ লেডি কিলড্ মি। কুড ইউ ডিনাই? ইউ প্লিজ লিভ মি এলোন।'

'শিমুল, দেশ থেকে একটা কুকুর এলেও সামান্যতম ব্যবহার করা উচিত।'

'ডোন্ট ট্রাই টু টিচ মি।'

'শিমুল।'

'ইউ এ বিচ।'

গালিটা শুনে বোধহয় ও একটু তেতে উঠলো। অথবা আশ্চর্য হলো। ওর কণ্ঠ শুনে ঠিক বুঝে উঠতে করতে পারলাম না। ও শুধু একটু গলা চড়িয়ে বললো, 'শিমুল।'

'হুয়েস, হুউ এ হার্ট'লেস লেডী, ইউ শিট, গেট আউট।'

'শিমুল, অমন কথায় কথায় ইংরেজী আওড়ো না। দু'দিন আগে এ দেশে এসে ভেবো না, ইংরেজ হয়ে গেছো। তুমি একটা অমানুষ। তোমাকে আমারই ঘৃণাই করা উচিত।' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো মেয়েটা। 'কি করে পারলে তুমি আমাকে কুত্তী বলে গালি দিতে?'

আমি চুপ করে রইলাম। বলার হয়তো কিছু ছিলো না। অথবা এমনিতেই চুপ করে ছিলাম।

'শিমুল এতো অহংকার ভালো নয়।'

আমি চুপ। রাগে দুঃখে দাঁতে দাঁত চাপছি। কি বলেছি অথবা অহংকার করেছি কি-না এসব ভাবার সময় পাচ্ছি না। ভাবার দরকারও বোধ করছি না।

'আমি চলে যাচ্ছি।'

আমি স্বাভাবিক নই। নাহলে নিশ্চয়ই এতোক্ষণে ভাবতাম—মেয়েটা যাবে কোথায়? সাথে কত ডলারই বা এনেছে? তাছাড়া একেলা বিদেশ বিভুঁয়ে একটা মেয়ে, একদম একাকী যাবে কোথায় ও? কিন্তু আমি এসবের কিছুই ভাবছি না। মাথাটা আমার ঘুরছে। পা দুটোও কেমন জানি কাঁপছে। ঠোঁট থর থর করলেও কোন এক টা শব্দও বের হচ্ছে না। ইচ্ছা হচ্ছিল জিজ্ঞেস করে ফেলি কোথায় যাবে? কিন্তু পারলাম না। তবে "ও যাবে কোথায় এই বিদেশে?" কথাটা মাথা থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দিতেও পারলাম না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'তোমার ক'টা জিনিস ছিলো।' সোনিয়া নীচু হলো। ট্রলি থেকে এক টা ব্যাগ নামালো হাঁটু গেড়ে বসলো। খুললো। একটা প্যাকেট বের করলো। একটা চিঠিও। প্যাকেটটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো। 'নিপাভাবীকে মনে আছে? তিনি দিয়েছেন।'

মেয়েটার টিটকারীর সুর আমার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিলো। প্যাকেটটা একহাতে ধরলাম, অন্যহাতে চিঠিটা। রাগে পকেটে চিটিটা ভরে ফেললাম।

'চিঠিটা পাওয়ার সাথে সাথে পড়তে বলেছেন।'

'কে বলেছে? শি···শি ইজ এ ফ্র···'নিপাভাবীকে ফ্রেড বলতে গিয়েও আটকে রাখলাম। ঠিক আটকে রাখিনি, বরং বলতে পারলাম না।

'বাহ্ বাহ্।' হাতে তুড়ি বাজালো সোনিয়া।

আরো মেজাজটা বিগড়ে গেলো আমার। আমার রাগ এমনই, চড়াং করে একেবারে মাইনাস ডিগ্রিতে উঠে যায়। নিয়ন্ত্রণ করাও দায় হয়ে যায়। এমনিতেই বুকের ভেতরটা আমার হাতুড়ি পেটা হচ্ছে।

'যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আমেরিকাতে এলে এমন হয়, শুনেছিলাম, চোখে দেখিনি, দেখলাম।'

'এয়ার পোর্টে চিঠি পড়ার মতো সময় হবে না।' পরিষ্কার ভাষায় জবাব দিয়ে ওটা পকেটে চেপে রাখলাম। প্যাকেটটা নিয়ে বললাম, 'আমার তাড়া আছে।' পা ফেলে এগিয়ে গেলাম। জানি পেছনে সোনিয়া হা হয়ে তাকিয়ে আছে। কিন্তু কি করবো? আমার মাথায় রক্ত আরো চড়ে যাচ্ছে। হয়তো গালাগালি করেই ফেলবো এই হারামজাদীই আমাকে দেশছাড়া করেছে, মা-ছাড়া করেছে, বাপের লাথি খাইয়েছে ও দ্বিচারিণী।

'দাঁড়াও।'

সোনিয়ার পিছু ডাকে আবারও থামলাম রাগ হলো, 'আবার কি?'

'ভীক্ষা যদি চাইতেই হয় তাহলে এখানে অনেক মানুষ আছে। কোন অমানুষের কাছে হাত পাতবো না, ভয় নেই।'

'লেকচার দিয়ো না। কি জন্য ডাকলে তাই বলো। তুমি ভীক্ষা করবে না অন্যকিছু···সেটা আমার দেখার ব্যাপার নয়।'

"অন্যকিছু।" কথাটা সোনিয়া উচ্চারণ করলো মুখ কুঁচকে, 'ছিঃ শিমু, আমার ভাবতেও ঘৃণা হচ্ছে, একদিন তোমাকে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতাম।'

'তোমার প্রেমের প্যানপ্যানানি শোনার মতো ধৈর্য আমার নেই।'

'তোমার মা কিছু পাঠিয়েছেন, সেগুলো নিয়ে যাও। সবে-বরাতের সারাদিন কষ্ট করে নিজে হাতে তোমার জন্য হালুয়া বানিয়েছেন। এগুলো আনতে আমাকেও পোর্টে "খাদ্য নেই" এই মিথ্যা কথাটাও বলতে হয়েছে। এগুলো নিয়ে যাও। একটা চিঠিও আছে।'

প্রথমে প্যাকেটটা আমার হাতে বাড়িয়ে দিলো ও। প্যাকেটটা ধরতে গিয়ে ওর হাতে আমার হাত ঠেকালো। বহু মাস পর ওর হাতের স্পর্শ পেলাম। ওর কেমন প্রতিক্রিয়া হলো, জানি না। তবে ওর হাতের ছোঁয়া আমার হাতে লাগতেই, আমার সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলো। শিহরিত হলো।

চিঠিটা ওর পার্শে। পার্শ খুললো। তার আগে ব্যাগটা বন্ধ করে ট্রলিতে রাখলো।

'এই নাও মায়ের চিঠি।'

খাম টা হাতে নিলাম। মায়ের হাতের লেখা, চিনতে কষ্ট হলো না। খামের উপরই লেখা, "এখনই, পাওয়ামাত্র খুলে পড় শিমু—তোর মা।"

'এটাও বোধহয় আজ পড়ার সময় এখন হবে না।' বিড়বিড় করতে করতে ট্রলিতে ধাক্কা দিলো সোনিয়া। আগে বাড়ছে, অর্থাৎ ও চলে যাচ্ছে। তবে গতি শ্লথ। হয়তো ভাঙ্গা মন নিয়ে কেউ জোরে হাঁটতে পারে না।

'আমায় রাগিয়ো না সোনিয়া।' রাগত কণ্ঠে বললাম। ও শুনলো কি-না জানি না, কারন রাগে আমার দাঁতে দাঁত চাপা ছিলো, কথার শব্দ জোরে বের হলো না। তাছাড়া সোনিয়া তখন ট্রলি ঠেলে অনেকটা এগিয়ে গেছে। এখন ওর সঙ্গে আমার দূরত্ব যতোটা, তাতে হয়তো নাও শুনতে পারে আমার কথাটা। তবে আমি কিছু একটা বলেছি, নিশ্চয়ই তা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু কি বলেছি শোনার কোন আগ্রহও প্রকাশ করলো না সোনিয়া।

খামটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম। মা। আমার প্রিয় মায়ের লেখা। কি লিখেছে মা? নিশ্চয় কিছু গুরুত্বপুর্ণ, নাহলে এখনই (পাওয়া মাত্র) পড়তে বলতো না। কোন খারাপ খবর না তো?

দ্রুত ছিঁড়ে ফেললাম। ছেঁড়া অংশটা পকেটে রেখে দিলাম। পরে গারভেজে ফেলবো।

ছোট্ট চিঠি। মাত্র ক'লাইন। একটা ছোট্ট আদেশ। চিঠিটা ছোট্ট কিন্তু আদেশটা বিরাট বড়। যা কোন ছেলের পক্ষেই ফেলা অসম্ভব।

"শিমু—ক্ষমা না-ই বা করতে পারলি কিন্তু একবারও ভাববি ন, এই অজানা জায়গায় মেয়েটা কার কাছে যাবে?

আমার "পিচ্চি বউমা"কে ক্ষমা দিস বা ন দিস, সে তোর

ব্যাপার, কিন্তু আশ্রয় যে দিতে হবে—এ আমার, তোর মায়ের আদেশ।"

চিঠিটা পকেটে দ্রুত ভরলাম। বিদ্যুতের মতো সটান হয়ে পিছু ঘুরলাম। চোখ মেললাম। চারপাশে চোখ ঘুরালাম। না, কোথাও সোনিয়াকে দেখতে পাচ্ছি না।

ছুটলাম। দ্রুত, অনেক জোরে। এয়ারপোর্টের মুখে এসে পৌঁছালাম। আমি তখন হাঁপাচ্ছি। চারপাশ তাকাচ্ছি। না কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। মেয়েটাকে গেলো কোথায়?

পুবদিকে সামান্য আড়াল, ওপাশটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। হয়তে ওদিকেই হবে। ছুটলাম। দু'হাতে দু প্যাকেট ধরা, দ্রুত ছুটতে অসুবিধা হচ্ছে। তবুও আমাকে ছুটতে হবে। থামা চলবে না। আমার হাতে একট কাগজ, সেই কাগজে যে মায়ের আদেশ।

ওকে তো যেতে দেওয়া যাবে না। ওকে থামাতেই হবে। ওযে মায়ের শক্ত আদেশ বহন করে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ময়েটা গেলো কোথায়? এত তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেলো নাকি? নাহ্, তা কি করে হয়? আমি তো মায়ের চিঠি পড়তে দেরি করিনি মোটেই।

পুব পাশের একদম কোনায় চোখ পড়লো। চোখটা আমার চক-চক করে উঠলো। আর্কিমেডিসের মতো চিৎকার করতে যাচ্ছিলাম, "ইউরেকা"।

ছুটে গেলাম সোনিয়া আমাকে দেখলে একবার। দেখেও না দেখার ভনিতা করলো। যেমন ট্রলি ঠেলছিলো তেমনই ঠেলতে লাগলো। মেয়েটা ভারি ট্রলি ঠেলতে গলদঘর্ম হয়ে গেছে। আর একটু

সামনে এগোলেই ও ট্যাক্সি পেয়ে যাবে। সামনে একটা ক্যাব। ক্যাবটাকে যাত্রীবিহীন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সোনিয়া সেদিকে এগোলো। স্পষ্টভাবে আমাকে অবহেলা করলো।

কিন্তু এখন আমার তেমন একটা রাগ হলো না। বরং মায়ের আদেশের কথাটাই মাথায় ঘুরতে লাগলো। রক্ত মাথা থেকে পায়ে নেমে গেছে।

'সোনিয়া।' ডাকলাম পিছন থেকে।

থামলো ও। পিছন ফিরে না তাকিয়েই আমার কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

'মা তোমাকে আশ্রয় দিতে বলেছেন।' কথাটা বলেই অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। চোখ মাটিতে নামানো আমার। বোধহয় ওর উত্তরের অপেক্ষ করছি।

'শুধু মা বলেছে বলেই···'সোনিয়ার বুকে অভিমান আঁটকে গেলো।

'হ্যাঁ।' ছোট্ট করে সত্য জবাবটাই দিলাম।

সোনিয়া দাঁড়িয়ে আমাকে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করলো। কি যেন ভাবলো হয়তো, যাবে কি-না?

'যদি না যাই?' সোনিয়া জিজ্ঞেস করলো।

'এটুকু বিশ্বাস আমার আছে, তুমি মাকে মিথ্যা বলবে না। নিশ্চয়ই বলবে, আমি তোমাকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলাম। মায়ের আদেশ আমি মাথা পেতে পালন করেছি। না যাওয়া, সেটা আমার নয়, তোমার ইচ্ছা।'

'আর যদি যাই?'

'মায়ের আদেশ পুরোপুরি মানবো। স্বেচ্ছায় একদিন চলে যাবে তুমি, তোমার সুবিধা মতো, কিন্তু আমি কখনও বের হয়ে যেতে বলবো না।'

সোনিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

আমিও।

আমিই ওর হাত থেকে ট্রলিটা নিলাম। ঠেলে সামনে নিলাম। আমার গাড়ির সামনে রাখলাম। পিছনের বয়োনেট খুলে একাই ব্যাগ দু'টো তুলে রাখলাম, লক করলাম। গাড়ীর লক খুললাম। পিছনের অংশের লকটাও খুলে দিলাম। গাড়ীর পেছনের দরোজাটা মেলে ধরলাম। ও বুঝলো, আমি ওকে পেছনেই বসতে বলছি। ও আমার দিকে একবার তাকালো। তারপর পিছনেই উঠে বসলো নিরীহ মেয়েটি মতো।

আমি কোন কথা না বলে সামনের ড্রাইভিং সিটে বসলাম। গাড়ীর বেল্ট বাঁধলাম। ষ্টার্ট দিলাম। গাড়ী আগে বাড়াবার আগে ক্যাসেটটা অন করলাম। গাড়ী চলার তালে তালে গান বাজতে শুরু করলো। এই গানটা বাজুক, আমি তা চাই নি। কিন্তু ঠিক ঐ গানটার আগেই যে ক্যাসেটটা অফ করেছিলাম, তা কি ছাই মনে আছে নাকি!

ইচ্ছা করলেই গানটা ফরোয়ার্ড করে দিতে পারতাম, কিন্তু তাতে আমি সোনিয়ার কাছে হয়তো ধরা পড়ে যাবো। ও হয়তো ভাববে, আমি এখনও ওকে ভাবছি, ওর অস্তিত্ব অনুভব করছি, তাই গানটা সরিয়ে দিলাম না। বাজুক। গানটা বজুক। বেজে চলেছে :

তোমারই ভাবনায়
আসে না ঘুম।
ঐ রাত যতই হোক নিঝুম ॥
তোমারই ভাবনায়
জেগে বসে গুনে যায়
প্রহরের ঐ ঘণ্টা
উদাস উদাস হয়ে যায়
একলা থাকা ঐ মনটা ॥
বিরহী তা জানে
কি ব্যথা কোনখানে ॥
তোমারই ভাবনায়···
ফুল ছড়ানো বিছানা
হায়রে কাঁটার শয্যা
লোকের কাছে বলবো কি
এতো আমার লজ্জা।
যদি এ যৌবনে
কেউ কাছে না টানে ॥
তোমারই ভাবনায়

ষোলো

দরজা খুললাম। ঘরে ঢুকলাম। হেমিলটনের বাঁশী বাদকের মতো আমি সামনে আর পিছনে মন্ত্রমুগ্ধ সোনিয়া। কোন কথা হচ্ছে না।

সোনিয়া ড্রইং রুমে ঢুকে চারপাশ নীরিক্ষণ করতে লাগলো। বেশ সাজানো গোছানো আমার ড্রইং রুম। দামী দামী আসবাবে ঠাঁসা। বোধহয় মনে করছে, এগুলো সব আমার। হতেও পারতো, ক্রেডিট কার্ড চার্জ করে মালগুলো কিনতে পারতাম। যতবেশি কার্ড চার্জ করবো ব্যাংক ততোই খুশি হবে। ওদের ব্যবসা হবে। বর্তমান আসবাবপত্রগুলো সব বাড়ীওয়ালার। ওগুলো সহই ভাড়া নিয়েছি।

ভেতরে ঢুকে আমি আর বসলাম না। আবার বের হয়ে এলাম। গাড়ীর পেছন থেকে ব্যাগদুটো টেনে বের করলাম। হিচঁড়ে ভেতরে ঢোকালাম। একটা ব্যাগে চাকা লাগানো ছিলো, অন্যটার জন্য ট্রলি ব্যাবহার করতে হলো, যথেষ্ট ভারী ওগুলো। ট্রলি ঠেলে দক্ষিণের রুমে রাখলাম।

সোনিয়া এতোক্ষণ ড্রইং রুমেই দাঁড়িয়ে ছিলো। আমি দোতলায় বেডরুমে থাকবো। ওখানেও ছোটখাট একটা বসার ঘর আছে। বাথরুম, গোসলখানা দুটো তলাতেই আছে। কিন্তু বড়

ড্রইংরুমটা আর ডাইনিং রুমটাই শুধু নীচে। মেহমান এলে নীচে বসা ও খাওয়ার ব্যবস্থা।

নীচের ঘর। আমি নীপাভাবীর জন্য আগে থাকতেই সাজিয়ে রেখেছিলাম। তবে ওখানে ছোট্ট একটা দুষ্টামী করে রেখেছিলাম। ডবল ফ্রেম বেড এর ওপর দু'টো বালিশ সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছিলাম। নিপাভাবী ওদুটো নিয়ে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে, তখন আমি বলতাম, তোমার সাথে আমিও শোবো, সেই সেদিনের মতো তোমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমুবো, তোমার গালে গাল ঠেকিয়ে রাখবো, হাসির মাত্রা আরো চালিয়ে বলতাম, তবে এবার আর থাপ্পড় খাবার মতো কোন কাজ করবো না।

কি ভেবেছিলাম, আর কি হলো?
কার কথা ভেবেছিলাম, আর কে এলো?

মাথার শিরাগুলো দপদপ করতে লাগলো। নীচে নামলাম। দু'টো ফ্রিজ, এক টা খোলা, এক টাতে তালা। তালা দেওয়া ফ্রিজ-টাতে মদ ও বিয়ারের বোতলগুলে লুকিয়ে রেখেছিলাম। নীপা-ভাবী প্রথমেই ওগুলো দেখলে, ঘাবড়ে যাবে, তাই।

লক খুললাম, "হাণ্ডেণ্ড পাইপার্স" বোতলটা বের করলাম। আইস পট টা নিলাম। পানির বোতল ও পটেটো চিপস্ প্যাকেট টা নিয়ে ড্রয়ং রুমে বসলাম। রাখলাম।

এখানে বসেই খেতে যাচ্ছিলাম, তারপর কি জানি ভাবলাম, সোনিয়া হয়তো অন্যভাবে নেবে, প্রথম প্রথমতো।

তাই ওগুলো ওপরে তুলে নিয়ে গেলাম। আজ একটু বেশি খাবো। কাল কাজ নেই, ছুটি। যতক্ষণ ইচ্ছা ঘুমাবো।

ড্রিঙ্ক শুরু করার আগে একটা কথা মনে হলো, মেয়েটা ক্ষুধার্তও তো বটে। একটা রাইটিং প্যাড টেনে নিলাম। লিখলাম, "ফ্রিজে খাবার আছে। ফল আছে। বিভিন্ন ফলের জুস আছে" তারপর প্যাড থেকে কাগজটা ছিঁড়ে ফেললাম। নামলাম নীচে, বলাবাহুল্য ড্রইং রুমের মাঝেই দোতলা ওঠার সিঁড়িটা। নীচে একটা টেবিলে কাগজ 1 পেপার ওয়েট দিয়ে ঢেকে রাখলাম। তখনও সোনিয়া তার ঘরে, হয়তো কাপড় ছাড়ছে, ফ্রেশ হচ্ছে।

ওপরে উঠে এলাম। একটা "Don't Disturb" কার্ড দরজায় ঝুলিয়ে দিলাম। যদিও দরজাটা খোলাই রইলো। কেন খুলে রাখলাম জানি না।

হঠাৎ মনে হলো, মেয়েটা যে আমেরিকাতে ভালোভাবে পৌছেঁছে তা তো দেশে জানানো উচিত। নিচে নামলাম।

সেই লেখা প্যাডটাতে লিখলাম, বাংলাদেশের কোড নম্বরটা। আরো লিখলাম, "প্রয়োজনে, অল্প সময় দেশে ফোন করতে পারো।"

উঠে এলাম ওপরে। বসলাম, চিপসের প্যাকেট থেকে ক'টা চিপস মড়মড় করে চিবাতে লাগলাম বোতলের মদ গ্লাসে ঢাললাম। একটু একটু করে গলায় ঢালতে লাগলাম।

একবার মনে হলো, নীপাভাবীর চিঠিটা খুলি, পড়ি। ইচ্ছাটা জোর করেই চেপে রাখলাম। থাক। ভাবী আমার সাথে এমন একটা চালাকি করলো, যা তার উচিত হয় নি। ভাবী তো জানে, আমি মেয়েটাকে দু'চোখে সহ্য করতে পারি না। তারপরও তাকে আমার কাছে কেন পাঠালো? সুপ্ত অভিমানেই ভাবীর চিঠি পড়া হলো না।

আরো ঢাললাম। প্রথমে গ্লাসে পরে গলায়। খুব ক্লান্ত লাগছে। এতো ক্লান্ত লাগার কথা নয়, ভাবলাম। পরে মনে পড়লো, সারা-দিন কিছু খাইনি। চোখ মুখ ঢুলুঢুলু।

'খাবে এসো।'

'কে?'

'আমি সোনি।'

'আই সে গেট আউট অফ মাই সাইট। তুমি আর কখনও আমার ঘরে ঢুকবে না।'

'মাতাল!'

'ইয়েস এ্যম ড্রাঙ্কার। বাট হু আর ইউ টু সে মি ড্রাঙ্কার?'

'বদমাইশ।'

'সোনিয়া।' দাঁত দাঁত চাপলাম। হাতে ধরা বোতলটা সজোরে চেপে রাগ কমাতে চেষ্টা করলাম। তারপর বললাম, 'সোনিয়া আমার কসম লাগে, তুমি আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। ইন্টারফেয়ার করো না। আমি তোমাকে এত ঘৃণা করি যে, আমার সঙ্গে তুমি কথা বলো তাও চাই না। তুমি তোমার থাকো, আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। নাহলে একটা অঘটন ঘরে যাবে। আমি তোমাকে খুন করে ফেলবো। আই হেট ইউ, আই হেট ইউ।' মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

'আমি চলে যাবো. তাই চাও তুমি?'

'জানি না। জানি না। সোনিয়া আল্লাহর দোহাই লাগে, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো না। আমাকে একা থাকতে দাও। তোমার যা ইচ্ছে তাই করো।'

'অহ্।' দীর্ঘশ্বাস ফেললো সোনিয়া। মনে মনে ভাবলো, নিজেকে জিজ্ঞেস করলো, ওর অপরাধ কি সত্যই এত বড়? ছেলেটার জন্য মায়া লাগে—সুদূর আমেরিকাতে এসেও ও পাগল রয়েই গেলো। আমার প্রভাব এখনও কাটিয়ে উঠতে পারলো না। পারলো না অতীতের সবকিছু এতোদিনেও ভুলতে? নিচে নেমে এলো। থাক ও ওর মতোই থাক।

ডাইনিং টেবিলে এলো। সাজানো অনেক খাবার। আপেল জুস খেলো। ক্ষিধে থাকা সত্ত্বেও খেতে পারলো না সোনিয়া। খাবে কি করে? একদিকে শিমুলের জন্য দুঃখ। অন্যদিকে ওর প্রতি শিমুলের ঘৃণা।

একবার সোনিয়া ভাবলো, চলে যাবে। হ্যাঁ চলে যাবে। এখনই চলে যাবে। এই অবস্থাতেই। চলে যাবার আগে ওকে বলে যাবে শুধু।

উপরে উঠলো, তবে মৃদু শব্দে। ঘরের সামনে গিয়ে যা দেখলো, তাতে করে সোনিয়ার রাগ পানি হয়ে গেলো। চলে যাবার কথা ভুলে গেলো। কিছু বলাও হলো না।

শিমুল কার্পেটে শুয়ে। একটা বালিশ বুকে জড়িয়ে হাউ মাউ করে কাঁদছে। একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো সেই কান্না। যা দেখে সোনিয়ার বুকের ভেতর কষ্ট হয়। শিমুল কাঁদছে, মা মা বলে ফোঁপাচ্ছে।

সোনিয়া যেমন নিঃশব্দে ওপরে উঠেছিলো, তেমনই নিঃশব্দে নিচে নেমে এলো। দু'চোখে ভরে গেলো কান্না। এবার ওর নিজেকেই দায়ী বলে মনে হচ্ছে। এসব কিছুর জন্য নিজেকেই

দোষি মনে মচ্ছে। ছেলেটাকে সে কতবড় দুঃখই না দিয়েছে! কিন্তু ও যদি এতোদিন ধরে এমন অনিয়ম করে থাকে, তাহলে ওর তো বেশিদিন বাঁচার কথা নয়। ও তো নিজেকে শেষ করে ফেলছে।

না। ওকে এভাবে মরতে দেবে না সোনিয়া। ওকে ছেড়েও যাবে না। ওর পাশেপাশে থাকবে, ওর সব অবহেলা মুখ বুজে সহ্য করবে। ওর সব অত্যাচার হজম করবে। নীপাভাবী বলেছে—দেখবি সব আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। পুরুষ মানুষ রাগ করে কতদিন থাকবে তুই খালি বরফে পানি ঢালবি, বরফ গলতে বাধ্য।

হ্যাঁ আমি তাই করবো। ওকে সব ভুলিয়ে দেবো। ওকে আমি আবার সঠিক জীবনে ফিরিয়ে আনবো। ওকে নতুন জীবন দেবো, নিজেও নতুন জীবন পাবো। ওকে আবার আগের মতো বুকে টেনে নিয়ে আদর করবো। ও আবার আমাকে "পিচ্চি বউ" বলে ডাকবে।

সোনিয়াও খুব কাঁদলো। এতো কান্না জীবনে সে কাঁদেনি মনে হচ্ছে। বুকের ভেতর থেকে ডুকরে উঠে আসছে সেই কান্না।

ওরা দু'জনেই কাঁদছে। একজন ওপর তলায়, একজন নীচের তলায়। দু'জন কাঁদছে দু'জনার জন্য। দু'জন দু'জনকে আপন করে নিতে পারলেই এ কান্না হাসিতে ভরে যাবে। কিন্তু মাঝখানে অনেক বড় পাহাড়। ঘৃণার পাহাড়। ভুলের পাহাড়। বর্তমানে শিমুল কাঁদছে, সোনিয়া প্রায়শ্চিত্ত করছে।

তবুও ওরা দু'জন কাঁদছে।

সতের

ওরা দু'জন হাসছে।

নিপা আর রকিব হাসছে। ওরা দু'জন দু'জনকে ভালবেসেছে। দু'জন দু'জনকে পাবার পরিকল্পনা করছে। ওদের দু'চোখ জুড়ে সুখস্বপ্ন। নিপার জীবনের অতীত তলিয়ে গেছে। রকিবের জীবনের না পাওয়ার বেদনা হারিয়ে গেছে। ওরা যেন নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে। ওরা অতীতকে মুছে ভবিষ্যতের নতুন ছবি আঁকবে, যেখানে থাকবে না হানি, ভীড় করবে না তালপাতার সিপাই (নীপার মরহুম স্বামী)।

রকিব সেদিন রাতেই মাকে প্রস্তাবটা করেছিলো। রকিব সেইরাতে শিমুলের মতো মায়ের জায়নামাজের পাশে ঘুরঘুর করছিলো। কি ভাবে কথাটা বলবে চিন্তা করছিলো, কোথা থেকে শুরু করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলো না। মা-ই সুযোগটা করে দিলো।

মা : শিমুলের মতো দু'একশ টাকার দরকার পড়েছে নাকি? নাহলে ওর মতো নামাজের পাটির ধারে ঘোরাফেরা করছিস কেন?

রকিব : না মানে, একটা কথা।

মা : কি এমন কথা?

রকিব : মানে নিপার কথা

মা : নিপার কথা ! কি হয়েছে ওর ? আবার বকেছিস মেয়েটাকে ?

রকিব : না, এবার আমাদের রাগারাগি চুকে গেছে, ভাব হয়ে গেছে।

মা : ভাব হয়ে গেছে ?

রকিব : হ্যাঁ, না, মানে

মা : কি বলবি খুলে স্পষ্ট করে বল, প্যানপ্যান করিস না তো।

রকিব : নিপা কেমন মেয়ে মা ?

মা : খুব ভালো, কেন ?

রকিব : তোমার পছন্দ হয় মা ?

মা : তোর পছন্দ হয় ?

মা সরাসরি প্রশ্নটা এভাবেই ওকে করলেন। রকিব চমকে উঠলেও নিজেকে সামলে নিলো। তবে মা ওকে কথাটা বলার সুযোগ করে দিলেন।

রকিব : কেন এ প্রশ্ন করছো মা ? আমার পছন্দ হলে কি হয় ?

মা : কচি খোকা, কিচ্ছু বোঝ না, না ?

রকিব : মা···

মা : তোর বাবাও বলছিলো

রকিব : কি বলেছিলো মা ?

মা : বলছিলো মেয়েটা ভালো। ওকে যদি তুই পছন্দ করতিস, তাহলে ওকে রেখে দেওয়া যেতো। নাহলে মেয়েটাকে ধরে রাখা যাবে না। মেয়েটা ভীষণ ব্যক্তিত্বসম্পন্না।

রকিব : রেখে দাও, তোমাদের যখন ইচ্ছা।

মা : তুই যা তো এখন। তারাবীর নামাজ পড়তে হবে। তুই যা, ভাগ।

রকিব : আব্বাকে কখন বলবে মা?

মা : এতদিন তে গোঁ ধরে ছিলিস, বিয়ে করবি না। এখন তো তর সইছে না।

রকিব : আমি যাই।

রকিব সেই সময় থেকেই ঘরে বসে গুনগুন করে গান গেয়েছে। রাতে ডাইনিং টেবিলে খেতেও যায়নি। বাপের সামনে পড়তে চায়নি। তাছাড়া মায়ের সামনে নিপার মুখোমুখি হতে ওর কেমন লজ্জা লজ্জা লাগছিলো।

কিন্তু অনেক রাতে আবার সে'বারের মতো পাগলামী করলো রকিব। ছাদের পাইপ বেয়ে কার্নিশে নামলো। আবারও একই ভাবে জানালার শার্শিতে টোকা দিলো।

আজ নিপা চমকালো না। ও ছুটে জানালায় এলো, যেন অপেক্ষাই করছিলো। 'তোমার ছেলেমানুষি এখনও বন্ধ হলো না।' নিপা হেসে জানালা খুললো।

'এই জানো, মা রাজী। আব্বাও নাকি মাকে কথাটা বলেছিলো। মানে, আব্বাও রাজী।'

'আমি জানি।'

'তুমি জানো?'

'মা আমাকে বলেছে।' লজ্জায় মাথা নামালো নিপা।

'ওরে, আমার পাগলী দেখি লজ্জা পাচ্ছে।' রকিব জানালার

গ্রীল গলিয়ে হাত ভেতরে ঢোকালো। নিপার চিবুক ধরে, ওপরে তুললো। 'এই তাকাও, তোমার হবু স্বামীকে দেখবে না?'

'যাও।'

'কোথায়?'

'পড়বে কিন্তু। যাও, ছাদে উঠে পড়ো।'

'না পড়বো না।'

'না পড়লেও, চোর মনে করে নাইট গার্ড নীচে থেকে হাঁক-ডাক শুরু করবে।'

'তা বটে। রকিব চারপাশটা দেখে নিলো, এই এসোনা ছাদে। গল্প করা যাবে।'

'না বাবা না।'

'সম্পর্কটা ওরকম নয়।'

দু'জনেই হাসলো।

'আমি যায় আর তুমি

'দু'দিন পরে হলেও তো তোমায়

'অসভ্য!'

'এসোনা প্লিজ।'

'না।'

'কেন?'

'বিয়ের আগে কক্ষনো না।'

'কি?'

'বিয়ের আগে আমি আর তোমার সামনে যাবো না।'

'এ আবার কেমন কথা?'

'এটাই ঠিক কথা। তুমি যাও প্লিজ। আমার ভীষণ লজ্জা লাগছে।'

'ঠিক আছে।' হাসলো রকিব। 'তোমার সব লজ্জা সে'রাতে কিন্তু একসাথে শেষ করে দেবো। তৈরি থেকো।'

'বাঁদর কোথাকার।'

'বাদরামীর এখন দেখছো কি? রকিব নিপার হাতটা ধরে মুখে টেনে নিলো। চুমু দিলো। কাজটা এতো দ্রুত করলো, নিপা বাধাও দিতে পারলো না। জানালার গ্রীলে নিপার হাতটা একটু ঘঁষেও গেলো। 'গালের বদলে হাতেই দিলাম। শক্তি থাকলে গ্রীলটা ভেঙ্গেই ফেলতাম।' রকিব আর দেরি করলো না। পাইপ বেয়ে উঠতে লাগলো ছাদে।

নিপা মুচকি হাসলো। চুমু দেওয়া হাতটা নিজের গালে ঠেকালো, 'পাগল আর কি।'

আঠার

ওরা কেউ কারো সাথে কথা বলে না।

সোনিয়া আর শিমুল। সোনিয়া ওদের সম্পর্কটা স্বাভাবিক করতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। কিন্তু না, পারেনি। শিমুল কিছুতেই নমনীয় হচ্ছে না। কেবলই বেঁকে বসছে। ঠিক সহ্য করতে পারছে না সোনিয়াকে। সহজভাবে বোধকরি নিতেও পারছে না।

সোনিয়া বেশ ক'বার চেষ্টা করেছে। ওর সামনে গেছে। ক্ষমা চেয়েছে। খাওয়া এগিয়ে দিয়েছে। খেতে ডেকেছে, তোয়ালে এগিয়ে দিয়েছে। ঘড়িটা সাকালে হাতের কাছে রেখেছে। সেধে সেধে কথা বলতে চেষ্টা করেছে।

কিন্তু ফল হয়েছে অন্য রকম। শিমুল এখন ওর এসবকে জ্বালাতন বলে বিবেচনা করছে। এখন সারাদিন আর ঘরে ফেরে না। গভীর রাতে ফেরে, যখন ফেরে তখন নেশা করেই ফেরে। ঘরে এসে কিছু খায় না। চাবি ঘুরিয়ে তালা খোলে, কলিং বেল বাজায় না। (অবশ্য এদেশে সবাই চাবি ঘুরিয়ে খুলেই ঘরে ঢোকে, অতিথীরা বাদে নিচে ডাইনিং টেবিল। ফিরেও তাকায় না। সোজা ওপরে উঠে যায়। বগলে করে একটা প্যাকেট নিয়েই ঘরে ঢোকে। সকালে সোনিয়া বুঝতে পারে, ওটাতে থাকে মদের বোতল, নাহয় বিয়ারের কেইন।

সোনিয়া আর ওকে বিরক্ত করে না। শুধু একা একা কাঁদে। ওর হাবভাব দেখে সোনিয়া বুঝতে পারে, এরচেয়ে বেশি বিরক্ত করলে, ও যেটুকু সময়ের জন্য (গভীর রাতে) ঘরে ফিরছে, তাও হয়তো ফিরবে না।

তাই সোনিয়া ওর সামনে সহজে পড়ে না। পর্দার আড়াল থেকেই কান খাড়া করে থাকে। ওর পদশব্দ শোনে, বোঝে, ও এলো বা চলে গেলো। তবে হাল পুরোদমে ছাড়ে নি, তাহলে তো নিজের পথ নিজেই খুঁজে নিতো। যে দেশে মেয়ে পুরুষ সমান তালে চলে। যে দেশে চাকুরি গণ্ডায় গণ্ডায় (অড জব)। সে দেশে একটা মেয়ের পক্ষে নিজের অন্ন, আশ্রয় সংস্থান করা খুব সহজ কাজ। ও এখন সময়ের দিকে তাকিয়ে আছে। সময়ই সবকিছু হয়তো অচিরেই বদলে দেবে। ভাবে—একদিন না একদিন শিমুল ওকে বুকে টেনে নেবেই। ওর শিমু ওরই বুকেই ফিরে আসবে।

কাল ছুটির দিন, রবিবার। একবেলা ঘরে থাকবে শিমুল। দুপুরে বাইরে যাবার আগে ঘরেই খাবে। সকালে নাস্তাও ঘরে করবে। তবে সকালে ও খুব হালকা নাস্তা করে, বেশির ভাগ সময় ফলই খায়। কিন্তু ছুটির রাতে ও একটু বেশি ডিঙ্ক করে। সকালে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেজন্যই বুঝি ঘুমায়।

সকালে শিমুর সান্নিধ্য পাবে। কিছু সময়ের জন্য হলেও ও ঘরে থাকবে। ওর নিশ্বাস ঘরে ঘুরবে। খুব খুশি লাগে সোনিয়ার।

কিন্তু সকালটা হলো অন্যরকম।

যা ভেবেছিলো, তা তো হলোই না বরং হলো উল্টোটা।

সম্পর্কের উন্নতিতে চিড় ধরলো। এমন ঘটনা সোনিয়া আশা করেনি। ঘটনা এমন হলো, যার পর আর এখানে থাকাও চলে না।

খুব সকাল থেকেই সেদিন সোনিয়া কাজে লেগে গিয়েছিলো। নাস্তা তৈরি করেছে নিজের হাতে। মুরগির স্যুপ তৈরি করেছে। আজ দুপুরেও নিজের হাতে লাঞ্চ তৈরি করবে ও। তাই মাংস, মাছ ফ্রিজ থেকে বের করে ভেজাতে দিয়েছে। পোলাও'র চাল এখানে দুষ্প্রাপ্য। পাকিস্তানের বাসুমতি চাল আছে। ওটা দিয়েই পোলাও রান্না করবে। শিমুল বুঝবে, সোনিয়া ওর জন্য খেটেছে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক। ও তখন স্যুপ জাল দিচ্ছিলো। ইচ্ছা ছিল, স্যুপটা একটু ঘন করে রান্না করার। ঠিক তখন কলিং বেলটা বেজে উঠলো।

এখানে কলিং বেল অতিথি ছাড়া বড় একটা কেউ বাজায় না। দুধওয়ালা দুধ দরজায় রেখে যায়। পোষ্টম্যান বক্সে চিঠি ফেলে যায়। ফেরিওয়ালা বা ফকির, এসে কলিং বেল বাজাবে, প্রশ্নই আসে না।

কলিং বেল আবারো বাজলো।

তাহলে কে? সোনিয়া ভাবছে, ও কি দরজা খুলে দেখবে? কিন্তু যে এসেছে সে তো শিমুলের কাছে। ওর তো অপরিচিত। তাছাড়া শিমুলের ঘরে একা ওকে দেখলে সেই লোকই বা কি ভাববে?

কলিং বেল আবারও বাজলো।

তখনও ইতস্তত করছে সোনিয়া। কি করবে? খুলবে না শিমুলের জন্য আপেক্ষা করবে? কিন্তু শিমুল ঘুমুচ্ছে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে মদ খেয়েছে, গান শুনেছে। এ সময় যদি ঘুম থেকে ওঠে তাহলে ওর কষ্ট হবে।

কলিং বেল আবারও বেজে উঠলো।

এবার সোনিয়া এগিয়ে গেলো। দরজা খুললো। সামনে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে। ভুর ভুর করে করে সেন্টের গন্ধ ঘরে আছড়ে পড়লো।

'দিজ ইজ লিণ্ডা।' হাত বাড়িয়ে দিলো মেয়েটা।

সোনিয়াও হাত বাড়িয়ে দিলো। হ্যাণ্ডশেক করলো। যদিও একটু ভড়কে গেলো, তবুও ইনটোডিউজ হতে হয়, 'দিজ ইজ সোনিয়া।'

'আর ইউ ইণ্ডিয়ান?'

'নো, ব্যাংলাদেশী।'

'অল দ্যা সেম।' মেয়েটা বললো। যদিও লিণ্ডার ধারণা ভুল। কিন্তু ভুল ভাঙ্গিয়ে দেওয়ার মতো ইংরেজি ষ্টক হয়তো সোনিয়ার নেই। তাই চুপ করেই রইলো। মেয়েটা ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বললো, 'ইউ আর ভেরি সুইট লেডী।'

'থ্যাংক ইয়্যু।'

'হোয়ার ইজ শিমু?'

'আই থিংক হি ইজ স্লিপিং। ইউ ডু কাম ইন, প্লিজ মিস লিণ্ডা।'

'ওহ্ হানি। কাম অন।' শিমুলের ঘুম কলিং বেলের শব্দে ভেঙ্গে গেছে। ও লিণ্ডাকে দেখে একছুটে নেমে এলো। জড়িয়ে ধরলো লিণ্ডাকে। দু'গালে দুটো চুমু খেলো। আজ একটু বেশিই করলো, ইচ্ছা করেই। কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে টেনে নিলো। 'কাম অন, মাই সুইট হানি।'

সোনিয়া বুঝলো, সবটুকুই শিমুল ওকে দেখালো। অপমান করলো। মেয়েটাকে চুমু খেলো, কোমর জড়িয়ে ওপরে নিয়ে গেলো। হাসি পেলো—আজ লিণ্ডা নামের এই আমেরিকানটা হয়েছে সুইট হানি। আর একদিন ও ছিলো শিমুলের সুইট হার্ট। কত বদলে গেছে শিমুল

সোনিয়া ফিরে এলো ডাইনিং টেবিলে। ভেজানো মাছ মাংস আবারও ফ্রিজে তুলে রাখলো। রান্না করবে না। স্যাপের বাটিটা বেসিনে উল্টে দিলো। ফেলে দিলো। তারপর নিজে না খেয়েই বালিশে মুখ গুঁজে খুব কাঁদলো। এবং তখনই সিদ্ধান্ত নিলো, আর নয়। শিমুলের অনেক অধঃপতন হয়েছে। যা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ঘরে বসে মদ খাচ্ছে। ওর সঙ্গে কথা না বলে অবহেলা করছে। ওকে অগ্রাহ্য করছে, ও অনেক সহ্য করছে নিপাভাবীর উপদেশ মনে রেখে ভেবেছে—একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এবার সিমুল ঘরে মেয়ে আনতে শুরু করেছে। সামনে জড়িয়ে ধরে চুমু দিতে আরম্ভ করে। আর সহ্য করা যায় না। অসম্ভব।

মেয়েরা অনেক কিছু সহ্য করতে পারে কিন্তু অন্য মেয়ের কাছে নিজের অপমান সহ্য করতে পারে না। মদে হিংসে না করে থাকতে পারে, কিন্তু মেয়েতে পারে না। স্ত্রীরা যেকোন অবস্থাতে যেকোন ভাবে স্বামীকে ধরে রাখতে চেষ্টা করে, তবু বাইরে যেতে দেয় না। এটা মেয়েদের ধর্ম।

কানে হাসির শব্দ এলো। ওরা দু'জন ড্রইং রুমে এসে বসেছে। হাসির খিল খিল শব্দের সাথে গ্লাসের টুং টাং শব্দও পাওয়া যাচ্ছে।

সোনিয়া উঠলো। জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে পর্দ্দাটা একটু ফাঁক করলো। চোখ রাখলো। যা দেখলো, তাতে নিজেরই লজ্জা পাবার অবস্থা। থুথু ছেটাতে ইচ্ছা করে। এই ওর শিমুল! এই আমেরিকা! আর এখানে আমাদের দেশ থেকে ছেলেরা আসে পড়তে? না-কি নষ্ট হতে? শিমুলের হাতে মদের পেগ। মেয়েটার হাতেও। শিমুল মাথা রেখেছে মেয়েটার বুকে, আড় হয়েছে সোফাতে মেয়েটা। ওর মুখটা অনেকটা নামিয়ে শিমুলের মুখে প্রায় সেঁটে রেখেছে। মাঝে মাঝে শিমুলের গালে মেয়েটা নিজের গাল ঘঁষছে। ছিঃ কি বিশ্রি দৃশ্য। শিমুল! ওর সেই শিমুল, আজ অন্য একটা মেয়ের উঁচু বুকে মাথা ঘঁষছে, তাও তারই সামনে! এর পরও ও এখানে থাকবে? এরপর তো কমপ্রোমাইজের প্রশ্নই আসতে পারে না।

কান্না মুছে ফেললো। না কান্না নয়। শিমুলকে নষ্ট মনে করছিলো। কিন্তু এখন দেখছে শিমুল পচে গেছে। ওর সঙ্গে থাকার ইচ্ছা নিমেষেই উবে গেলো ওর। কেঁদে কি লাভ? সিদ্ধান্ত নিলো, হোষ্টেলে চলে যাবে। অথবা অন্যকোথাও, এখানে আর নয়।

ঘণ্টা খানেক ওদের হাসির খলখল শব্দ ওর কানে গরম শীশা বর্ষণ করলো। ও ঘর থেকে বের হলো না। ওরা বাইরে যাবে, শিমুল ওপরে চলে গেলো কাপড় পাল্টাতে।

লিণ্ডার যেন হঠাৎ করেই মনে পড়লো সোনিয়াকে। ডাইনিং টেবিল ও কিচেন ঘুরে এলো। সোনিয়াকে পেলো না। চিৎকার করে ডাকলো, 'হেই, ইণ্ডিয়ান সুইট লেডি, হোয়ার ইউ আর?'

সোনিয়া কোন জবাব দিলো না। যেমন বসে ছিলো, তেমনই বসে রইলো। যদিও ও জানে, শিমুল নীচে নেই, ওপরে। তবুও বের হচ্ছে না।

লিণ্ডা বুঝলো, নীচের ঘরেই আছে সোনিয়া। তাই ও নীচের ঘরের দরজায় টোকা দিতে লাগলো।

'কাম অন হানি।'

শিমুল দৌড়ে নীচে নেমে এলো। 'ওহ্ হানি কাম'ন লেটস্ গো। প্লিজ ডোণ্ট ডিস্টার্ব হার। শি ইজ ফাইন বাট রেষ্ট লেস।'

'ওহ সরি।' লিণ্ডা দরজার কাছ থেকে সরে এলো। 'সরি। অ্যাম সরি।'

লিণ্ডার টোকা বন্ধ হতেই সোনিয়া উঠে দাঁড়ালো। জানালার পর্দ্দা সামান্য তুলে উঁকি দিলো। শিমুল আর মেয়েটা হাত ধরাধরি করে বের হয়ে গেলো। দরজার অটো-লক'এ ভেতর থেকে টিপ দিয়ে দরজাটা টেনে দিলো।

সোনিয়ার নিঃশ্বাস এতোক্ষণ বন্ধ ছিলো, ওরা চলে যেতেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো ওর মাথার সবক'টা শিরা উপশিরা দপদপ করছে, ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। যেন অনেক কষ্টে ওগুলোকে টিকিয়ে রেখেছে।

আজ একটু ও বাইরে বেরোবে। ডুপ্লিকেট চাবি কি-বোর্ডেই আছে। হয়তো ওর জন্যই। বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। চাকুরির বাজার যাচাই করতে হবে। যদিও ওর এখানে থাকার লিগ্যাল পারমিশন ছাত্রী হিসেবে, তবুও চেষ্টা করতে দোষ

কি? ও যতদূর জানে, আমেরিকাতে কেউ কাউকে জিজ্ঞেসও করে না। অপরাধ না করলে থানা পুলিশ খোঁজ করার সময় পায় না। আজ দুপুরে ও বাইরে খাবে। ঘুরবে। দেখবে। অবশ্য জানে, আজ শিমুল দিনে আর ফিরছে না। রাতের শিফটে ছুটির দিন একটা কাজ করে, সেটা করেই ফিরবে।

কি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট। একফোটা ধুলো নেই। ঘাসে ঢাকা মাটি আছে, কিন্তু ধুলো নেই, সময়মতো পানি ও পরিচর্চা দুই-ই করে। রাস্তাঘাটে সবাই ব্যস্ত। যে যার পথে হেঁটে যাচ্ছে। গাড়ীতে ছুটে যাচ্ছে। ও একাই হাঁটছে, কিছুক্ষণ চলার পর একটা বড় মার্কেট। প্রতিটা দোকানের দিকে চেয়ে থাকতে মন চায়। কি সুন্দর করে সাজানো, যেন ছবি। কত সুন্দর সুন্দর সুদৃশ্য জিনিস রাখা যা সোনিয়া ওর জীবনে দেখেনি।

অনেক দোকানেই "হেল্প ওয়ান্টেট" লেখা অর্থাৎ চাকুরি খালি। মনে ভরসা হলো, একটা কাজ জুটিয়ে নিতে হয়তো পারবে ও। সবগুলো দোকানে কম্পিউটার, মালামালের লেবেলের ওপর দাগ দেখে আগে জিনিস টা বুঝতে পারতো না। এখন পরিস্কার হলো, ওগুলোই দাম।

কম্পিউটার দাম রিড করে (অনেক বিদেশী দ্রব্যের লেভেলের ওপরই মোটা সরু কিছু দাগ লক্ষ্য করলে বুঝবেন)।

দুপুরের কি খাবে (?) পয়সা কড়ি তেমন নেই। শিমুলের কাছে বলেও নি। শিমুল ঘরের চাবি, ফোন, খাবার এসব নিয়ে ভেবেছে কিন্তু ওর নগদ পয়সা দরকার হতে পারে ভাবেনি, তাই ওটা সরবরাহও করেনি।

সারাদিন ঘুরে যতটা ক্লান্ত হবে ভেবেছিলো সোনিয়া, ততটুকু হয়নি। নতুন নতুন জিনিস আর স্থান দেখার মধ্যে ক্লান্তি কম, নেই বললেই চলে। শেষ বেড়ানোটা হলো সী-বিচে। সুন্দর। তবে মেয়েদের পোশাকটুকু বাদ দিলে সবই সাজানো গোছানো। মেয়েরা পোশাকের বেলাতেই বুঝি কৃপণ। এখানে বীচে একগাদা পুরুষের পাশাপাশি অমন উদোম শরীরে মেয়েরা কি করে থাকতে পারে, তা বোঝা ওর সাধ্যের বাইরে।

রাত ঘনিয়ে এলো। বাইরে বেশি রাত করার অভ্যাস নেই। তাছাড়া ঘরটা খুঁজে যেতে হবে তো। যদিও ঠিকানাটা মুখস্ত।

রাতে ঘরে ঢুকলো। মুখ হাত ধুলো। দু'চোখ জুড়ে ক্লান্তি। কিছু খেতে ইচ্ছা করলো না। যদিও পেটে প্রচণ্ড ক্ষিধা অনুভব করছে তবুও খেলো না। ঘরে ঢোকার পর থেকে সকালের সেই দৃশ্যটা বার বার মনে পড়ছে। এতক্ষণ ভালোই ছিলো আবার মাথার শিরগুলো খুলে পড়তে চাইছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড় হচ্ছে। বিছানায় শুয়ে পড়লো ক্লান্তি সারা শরীর জুড়ে। সন্ধ্যা-রাতে কখন ঘুমানো অভ্যাস নেই কিন্তু আজ ঘুমিয়ে পড়লো।

রাতে ঘুম ভাঙ্গলো। বেডরুম থেকে বের হলো। ক্ষিধেতে পেটটা চোঁ চোঁ করছে। ডাইনিং টেবিলে বসলো। ফ্রিজ থেকে মাখন বের করলো। রুটিতে মাখালো। কামড় দিলাম। সঙ্গে চুমুক দিচ্ছে আঙুর জুস ক্যানে।

একা একাই খাচ্ছিলো। কখন যে শিমুল নেমে এসেছে বুঝতে পারিনি। ও উপর থেকে নেমে এলো, না বাইরে থেকে এলো তাও

বলতে পারবো না। আসলে সোনিয়া ছিলো অন্যকোন চিন্তায় মগ্ন।

শিমুল ফ্রিজ খুললো। একটা বোতল বের করলো। টেবিলের ওপর থেকে পটেটো চিপসের গোল প্যাকেটটা নিলো। ওপরে চলে যাচ্ছিলো।

সোনিয়া পিছন থেকে ডাকলাম। 'শিমুল।'

শিমুল থামলো। কিন্তু পিছন ফিরলো না। অপেক্ষা করতে লাগলো সোনিয়ার কথা শোনার।

'তোমার মিনিট পাঁচেক সময় হবে, আমার কথা শোনার?'

শিমুল ওভাবে দাঁড়িয়েই রইলো মুহূর্ত খানেক। তারপর বললো, 'গন্ধ খারাপ না লাগলে, আমি নিচে বসেই মদ খাই, এখানে বসেই শুনতে পারি তোমার কথা।'

'আমার খারাপ লাগার কথা ভাবো তাহলে?'

'মূল্যবান কথা না থাকলে মদ খাওয়ার আমেজটা নষ্ট করো না। যদিও পাঁচ মিনিট সময় নেবে বলেছো তুমি।' শিমুল সোফায় বসতে বসতে বললো।

'আমি কাল চলে যাবো।'

শিমুল চুপ। বোতল গ্লাস আর গলা—এই তিনস্থানে ঐ তরল পদার্থটির অবস্থান বদলাচ্ছে।

'আজ তুমি যা করলে লিণ্ডাকে নিয়ে, এরপর আর তোমার এখানে থাকা আমার সম্ভব নয়। উচিতও নয়।'

গ্লাসে পানি কম মেশালো শিমুল। আইসের দুটো টুকরো ছেড়ে দিলো। তারপর ওটা গড়গড় করে গলাতে গড়িয়ে দিলো। মুখটা

একটু বিকৃত করলো। বোধহয় কড়া লেগেছে। ক'টা চিপস্ মুখে দিয়ে চিবোতে লাগলো।

'জানি না কালকের মধ্যেই সব ব্যবস্থা করতে পারবো কি-না, তবে আপ্রাণ চেষ্টা করবো। কারণ এখন বুঝি, তোমার মতো আমিও তোমাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছি। ঘৃণ্য লোকের সংস্পর্শ থেকে যত তাড়াতাড়ি পালানো যায়. ততই ভালো।' সোনিয়ার দু'চোখ অশ্রুতে ভরে গেলো। পেপার টাওয়াল দিয়ে মুছে নিলো। 'কাল রাতে ফিরে আমাকে ঘরে না দেখলে বুঝে নিও, আমি চলে গেছি।'

শিমুল কোন কথা বললো না। ঘড়ির দিকে তাকালে শুধু। অর্থাৎ পাঁচ মিনিট শেষ।

'হ্যাঁ আমার কথা শেষ।' সোনিয়াও শিমুলের ঘড়ি দেখার কারণ বুঝে জবাব দিলো।

বগলে বোতল, হাতে গ্লাস, অন্য হাতে চিপস নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। শিমুল একবারের জন্য সোনিয়ার মুখের দিকে তাকালো। এবং এই প্রথম বার। সোনিয়া ওর দিকে চেয়েই ছিলো, চোখাচোখি হলো। তা আমেরিকাতে প্রথমবার।

শিমুল চোখ সরিয়ে নিলো। খুব মৃদু পায়ে ওপরে উঠতে লাগলো একটু টলছে, হালকা নেশা হয়েছে ওর।

জানি না ওর কানে কথা। বাজছে কি-না 'কাল রাতে ফিরে আমাকে ঘরে না দেখলে বুঝে নিও, আমি চলে গেছি।'

রাত তখন ক'টা হবে, জানি না। অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে চোখটা একটু লেগে এসেছিলো। ভাবছিলাম—সোনিয়ার কথা।

ভাবছিলাম, এখন আমি কি করবো? কি করা উচিত? বার বার নিজেকে একটা প্রশ্ন করছিলাম, আমি সোনিয়াকে ঘৃণা করেও কি সুখী হতে পেরেছি? সোনিয়া কি সত্যিই অমার্জনীয় অপরাধ করেছে?

সোনিয়া চলে যাবে, যাক না। তাতে আমার কি? আমি তো ওকে ঘৃণা-ই করি। ওর চলে যাওয়া, না-যাওয়াতে আমার কি? বরং চলে যাওয়া আমার তো ভালো লাগারই কথা। কিন্তু মেয়েটা যাবে কোথায়? কার কাছে? মেয়েটা ওর অবহেলার কারণেই চলে যাবে জিদ ধরেছে। কিন্তু কোথায় যাবে, কিভাবে সেটেল করবে? এসব নিশ্চয় মেয়েটা এখনও ভাবেনি। এমনও তো হতে পারে মেয়েটা দেশে ফিরে যাবে। এত কষ্ট করে এতদূর এসেছে, তারপর চলে যাবে, এটা কি ঠিক?

মাথাটা আমার ঘুরছে। কেন একটা সিদ্ধান্তে স্থির হতে পারছি না। মেয়েটাকে পুরোপুরি ভাবে বোধহয় ঘৃণাও করতে পারছি ন। ওর অতীতের দু'একটা কথা মনে পড়লে আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। একথা সত্য। তখন সোনিয়াকে তীব্র ঘৃণা করি। কিন্তু অনুতপ্ত হতেও তো পারি।

এতোসব ভাবছিলাম—ওর চলে যাওয়ার প্রস্তাবে তো আমি কোন মন্তব্যই করলাম না। যখন ও সত্যিই চলে যাবে, তখনও কি এমনই মূর্তি বনে থাকতে পারবো? আর যদি কাল রাতে ফিরে এসে দেখি, ঘর আমার শুন্য, সোনিয়া চলে গেছে, তখন খারাপ লাগবে না?

হাসি পাই আমার ? শুন্য লাগবে কেন ? এখনই কি টের পাচ্ছি ঘরে আমি ছাড়া আরও একটা লোক আছে।

হঠাৎ কানে আবছা ফোনের শব্দ ভেসে এলো। কানটা খাড়া রাখলাম, হ্যাঁ বাজছে। চোখদুটো ঘুমে জড়ানো। নেশায় বুদ হয়ে রয়েছি। চোখ খুলে উঠবো, ফোনটা ধরবো এমন শক্তি নেই। খুব রাগ হলো, কে রে বাবা এতো রাতে ? বাজুক, খানিকটা ধরে থাক। নেহাত দুর থেকে এবং বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে কেউ বেশিক্ষণ ধরে রাখবে না। ছেড়ে দেবে। উঠতে একটুও ইচ্ছে করলো না।

হঠাৎ যেন চিৎকার শুনলাম। চোখটা অনেক কষ্টে মেললাম। 'কে !' সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে ধাক্কাচ্ছে সোনিয়া।

'শিমুল ওঠো, দেশ থেকে জরুরী কল এসেছে। খুব সিরিয়াস খবর মায়ের।'

'সিরিয়াস খবর মায়ের !' আমার মনে নেই, সোনিয়ার হাতটা ধরে ফেললাম। ওর হাতটা ধরেই লাফিয়ে উঠলাম। 'কি হয়েছে মায়ের। তোমাকে কিছু বলেছে সোনি ?'

আমার তখন কিছুই চিন্তাই আসছে না। সোনিয়ার কাঁদো কাঁদো চেহারা দেখেই আমি সব বুদ্ধি হারিয়েছি। সোনিয়ায় চোখ-দু'টো হঠাৎ করে আরো অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। আমার মুখে ওর নাম শুনে, অথবা ওর হাতটা ছোঁয়ার জন্য কি-না, একবারও ভাবিনি। আমার শুধু মনে হচ্ছে, মায়ের কি এমন খবর ?

'তুমি নীচে এসো শিমুল।' আমার হাত ধরে টেনে তুললো সোনিয়া।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। দ্রুত এগোতে গেলাম। তখনও আমার নেশার ঘোর কাটেনি। ঢলে পড়তে পড়তে সোনিয়াকে ধরে ফেললাম সোনিয়াও আমাকে ওর বুক দিয়ে আগলে ফেললো। ওর নরম বুকে আমার বুকের ঠেকার সাথে সাথে যেন আমার সারা দেহে বিদ্যুৎ খেলে গেলো। নেশা কেটে গেলো। ওকে ছেড়ে দিলাম। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম। ফোনের রিসিভার কানে চেপে ধরলাম।

'হ্যালো, শিমুল স্পিকিং।'

'আমি রকিব।' অপর প্রান্ত।

'কি খবর ভাইয়া?'

'ওরে শিমু, মায়ের অবস্থা খুব খারাপ। গতকাল সন্ধ্যাবেলা ওজু করতে গিয়ে বাথরুমে পড়ে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে জ্ঞান হারিয়েছেন। এখনও জ্ঞান ফেরার কোন লক্ষণ নেই।'

'ডাক্তার কি বলে ভাইয়া?'

'ডাক্তার কিছু বলতে পারছে না।'

হঠাৎ অপর প্রান্তের ফোনের হাত বদল হলো। আমি বুঝতে পারলাম, ভাইয়ার হাত থেকে রিসিভার অন্য কেউ নিয়ে নিলো, আব্বু।

'বাবা শিমু, আর কতদিন অভিমান করে দূরে থাকবি? আমার ওপর রাগ করে তোর মায়ের ওপর অবিচার করিস কেন? তোর মা তো তোর চিন্তাতেই অর্ধেক হয়ে গেছে।'

'আব্বু তুমি শান্ত হও।' আমি বেশ বুঝতে পারছি, আব্বু কাঁদছে।

'এখন কি হবে শিমু? তোর মা যে কাল থেকে কথা বলছে না?' শিমুলের আববু বাচ্চা ছেলের মতো কথা বলছে। কে বলবে ওর চির-গম্ভীর এই সেই আব্বা।

'আব্বু, আমি যত তাড়াতাড়ি পারি টিকিট কনফার্ম করে চলে আসছি। তুমি শান্ত হও। অমন করো না। আম্মা নিশ্চয়ই ঠিক হয়ে যাবেন।'

'তুই আসবি বাবা?'

'আসবো আব্বা।'

'আয়, শিমু তাড়াতাড়ি আয়। তোর মায়ের জন্য হলেও আমাকে ক্ষমা কর। সেদিন আমি খুব অন্যায় করেছি। বুঝতে পারিনি, এতে দুরে চলে যাবি। সেদিন আমি তোকে তোর মায়ের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে দেইনি।'

'থাক আববু, অসব কথা থাক। আমি ওসব কথা তো কবেই ভুলে গেছি।'

'সত্যি বলছিস শিমু?'

'হ্যাঁ আব্বা।'

'নিপা মা কথা বলবে, ধর।'

নিপার কণ্ঠ : শিমু তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো চলে এসো, সব কথাই তো শুনলে। আজ আর কোন কথা বলার মতো সময় এবং মানসিকতা আমাদের কারো নেই। তুমি বেশি মন খারাপ করবে না। যত তাড়াতাড়ি পারো চলে এসো। ও. কে?

'ও. কে।'

টেলিফোনের ক্রাডেলে রিসিভারটা রাখলাম। দু'চোখ অশ্রুতে ভরে গেলো। মাথাটা ধরে বসে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ, অনেকক্ষণ

'শিমুল।' সোনিয়া ওর মাথায় হাত রেখে ডাকলো।

'হু।' সোনিয়ার যে হাতটা আমার মাথায় রাখা, ওটাতে আমি হাত রাখলাম, ধরলাম। 'সোনিয়া মায়ের কিছু হবে না তো? আমি কি গিয়ে মাকে দেখতে পারবো?'

'তুমি এমন ভেঙ্গে পড়ছো কেন? মানুষের জ্ঞান হারায় না? বয়স্ক মানুষ তাই একটু বেশিক্ষণ অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন, এতে কাঁদার কি আছে?' আঁচলটা বাড়িয়ে ওর চোখ মুছতে লাগলো সোনিয়া, 'নাও চোখ মোছো।'

'আমার খুব খারাপ লাগছে মায়ের জন্য, শুধু কান্না পাচ্ছে। জানি না

'ওসব কথা উচ্চারণ করতে নেই।' আমার মুখটা ডান হাতে চেপে ধরলো সোনিয়া, 'আল্লাহ্ আল্লাহ্ করো, সব ঠিক হয়ে যাবে। মা সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

'তাই যেন হয়।' শিমুল সোফায় মাথা এলিয়ে দিলো, ভাবতে লাগলো কি করা যায়?

'সোনিয়া

'হু।'

'ক'টা বাজে।'

'রাত তিনটে।'

'অহ্ সোনিয়া এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খাওয়াবে?'

'ফ্রুট জুস দেবো?'

'না, প্লেন ওয়াটার।'

'আচ্ছা।'

সোনিয়া পানি এনে দিলো।

আমি খাওয়ার আগে চোখে মুখে ছেটালাম। তারপর এক চুমুকে সবটুকু খেয়ে নিলাম। ফোন গাইড খুঁজে ডেলটা এয়ার লাইনে ফোন করলাম।

ডেলটা এয়ার লাইন যা জানলো—মিয়ামী বা ওয়েষ্টপাম থেকে কোন সিট নেই। তবে পরশুদিন একটা থাই এয়ারের সংযোগ দিতে পারবে, ডাল্লাস থেকে, কিন্তু ওটাতে ব্যাংককে অবশ্যই একদিন হল্টেজ করতে হবে। আর একটা রুটে পরশু দিনের পরের দিন সিট আছে, সেটা যাবে ফ্রান্স হয়ে। তবে ন্যুয়র্ক থেকে ব্রিটিশ এয়ারের খবরটা আপনাকে বিশ মিনিট পরে জানানো হবে।

'ঠিক আছে, বিশ মিনিট পরেই আমাকে জানান। পারলে আগামীকাল অথবা পরশু সরাসরি লণ্ডন হয়ে বাংলাদেশে একটা সিট কনফার্ম করলে বাধিত হবো।'

টেলিফোন রেখে ওখানেই চুপ করে বসে রইলাম। 'ওপরে সিগারেটের প্যাকেট আছে আর ফ্রিজে মদের বোতল আছে, প্লিজ একটু দেবে সোনিয়া।'

বাধ্য মেয়ের মতো সোনিয়া চলে গেলো।

আমি বসে ভাবছি—মায়ের কোন খারাপ খবর নেই তো? খারাপ খবর হলে প্রবাসীদের এমন করেই শুধু বলা হয়, সিরিয়াস। আর কিছু জানানো হয় না।

সোনিয়া এলো। সামনের টেবিলে একটা ঠাণ্ডা হেলিক্যান বিয়ার রাখলো। ম্যাচ, সিগারেট রাখলো। 'নাও।'

'বোতল ?'

'প্লিজ শিম্‌ল, শুধু বিয়ার খাও।'

'আচ্ছা।' শান্ত ছেলের মতো ওর কথার প্রতিবাদ করলাম না। বিয়ারের মুখটা ন্যাপকিন দিয়ে মুছে নিলাম। ভেনে খুললাম। একটু মুখে দিলাম। সিগারেট জ্বালালাম আগুন দিলাম। সোনিয়া আমার পাশেই বসা। ওরও বোধহয় একই চিন্তা—মায়ের কি অবস্থা ?

টেলিফোন এলো, জানালো আগামীকাল বিকেলে একটা সিট পাওয়া যাবে। কিন্তু ওটা ন্যুয়র্ক থেকে ছাড়বে এবং ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজ।

আমি বললাম, 'ওটাই কনফার্ম করুন। আর আমাকে একটা টিকেট দিন, আমি যেন নির্দিষ্ট সময়ে ন্যুয়র্ক পৌঁছুতে পারি।'

জানালো —আজ সকাল এগারটার সময় ডেলটা এয়ারের একটা ফ্লাইট ন্যুয়র্ক যাচ্ছে। ওটাতে সিট এভেলএবল।

ওটাতেই বুক করলাম। টেলিফোন রাখলাম। আর একটা সিগারেট জ্বালালাম।

'তুমি বরং এখন একটু ঘুমিয়ে নাও। সারাদিন, সারারাত জার্নি করবে।'

'হুহু হ্যাঁ, তুমি আমাকে সকাল নয়টায় উঠিয়ে দিও। আমি একবারে বের হয়ে যাবো। আমার গোলড্‌ কার্ড (ক্রেডিট) আছে। চার্জ করে টিকেট করে নেবো। কিছু নগদ ডলারও সাথে নিয়ে

নেবো। অসুবিধা নেই—দেশে গিয়ে কার্ড চার্জ করতে পারবো দরকার মতো। সকালে কাপড় গোছালেই হবে।'

'কি কি নেবে সঙ্গে ?'

'বেশি কিছু নয়। ঐ মাঝারী লেদার সুটকেসে যে ক'টা কাপড় আঁটে। ক'টা প্যান্ট শার্ট, দুটো জুতো আর সেভ করার সরাঞ্জামাদী। ল্যাগেজ বেশি ভারি করার দরকার নেই।'

'ঠিক আছে, তুমি ওপরে যাও। ঘুমিয়ে নাও। শরীরটা ঝর-ঝরে হবে।'

'ও, কে, গুড নাইট।' আমি ওপরে উঠে গেলাম ঘুমুতে। তবে ঘুমোবার আগে হাতের ঘড়ি, টেবিল ঘড়ি, দেয়াল ঘড়ি সবক'টাতে এলার্ম দিয়ে রাখলাম। সোনিয়া ঘুমিয়ে পড়লেও যেন সময় মতো উঠতে পারি।

বিশ

সকাল নয়টা বাজতে দু'মিনিট বাকী।

'শিমুল ওঠো। আর ঘুমিয়ো না, সময় হয়ে গেছে।' সোনিয়া শিমুলের গায়ে হাত রেখে ধাক্কা দিলো।

'ন'টা বাজেনি তো।' আমি ঘুমের ঘোরেই বললাম। 'আর একটু ঘুমুতে দাও।'

'নয়টা বেজে গেছে। উঠে পড়ো লক্ষী।'

'না বাজেনি ন'টা।'

ঠিক তখনই আমার হাতের ঘড়ি, টেবিল ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি সবগুলো একযোগে বেজে উঠলো।

ধড়ফড় করে উঠে পড়লাম। উঠেই দেখলাম, সোনিয়া আমার পাশে বসে। একটু হাসতে চেষ্টা করলাম। চিরকালের অভ্যাস মতো বিছানা বালিশে দুটো থাপ্পড় দিলাম, ভাঁজ নষ্ট করার জন্য।

'থাক, আমি বিছানা ঠিক করছি। তুমি বাথরুমের কাজ সারো।' সোনিয়া কথাটা বলে আমাকে একপ্রকার ঠেলেই বাথরুমের দিকে পাঠিয়ে দিলো।

আমি বাথরুমে গেলাম। সেভ করলাম, মুখ ধুলাম, মাথায় শ্যাম্পো করলাম। গোসলটাও সেরে নিলাম। হালকা গরম পানি

মিশিয়ে গোসল করতেই শরীরটা তরতাজা মনে হলো। মুখে লোশন ঘষতে ঘষতে বাথরুম থেকে বের হয়ে এলাম।

'সোজা নাস্তার টেবিলে এসো।' কিচেন থেকে চিৎকার করে উঠলো সোনিয়া।

আমিও চিৎকার করে জবাব দিলাম, 'তার আগে ব্যাগটা গুছিয়ে নিতে হবে তো।'

'দরকার নেই, আমি গুছিয়ে রেখেছি সব। তুমি শুধু একবার চেক করবে, কিছু বাদ পড়লো কি-না।' কিচেন থেকে সোনিয়া বের হয়ে এলো। 'বাকী আছে শুধু তোমার সেভিং সরঞ্জামগুলো দেওয়ার, তুমি কাপড় পরতে পরতে আমি ওগুলো ঠিক জা'গায় রেখে দেবো।'

ডাইনিং চেয়ারে বসলাম। সোনিয়া এলো। খাবার এগিয়ে দিলো। আমি খেতে লাগলাম। মুরগির স্যুপটা দারুন হয়েছে, একটু বেশিই খেলাম। ইচ্ছা হচ্ছিলো, স্যুপের জন্য ওকে খুশি করি, কিন্তু পারলাম না। দ্রুত খেয়ে নিলাম।

'চা না কফি?'

সোনিয়ার প্রশ্নটা শুনে ওর দিকে তাকালাম। সবুজ পোশাকে যেন একটা কচি তাজা কলাপাতা লাগছে। হঠাৎ কলাপাতার সঙ্গে ওর কি সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম, জানি না।

'কিছু লাগবে না।'

'তা-কি করে হয়, পথে জড়তা লাগবে। নাও চা-ই খাও।' ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে এগিয়ে দিলো। 'অবশ্য কফিও খেতে পারো।' অন্য একটা ফ্লাস্ক এগিয়ে রাখলো।

বুঝলাম...মেয়েটা অনেক করেছে। জানি না রাতে ঘুমিয়েছে কি-না? কাপড় চোপড় গুছিয়েছে। চা, কফি বানিয়েছে, নাস্তা রেডি করেছে। তাছাড়া আমাকে জাগাবার জন্য তো সতর্ক থাকতেই হয়েছে। এখন উচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। হয়তো করতামও, কিন্তু নিজের দুর্বলতা ধরা পড়ে যাবার ভয়ে কিছুই বললাম না, শুধু ওর পানে কৃতজ্ঞতাভরা চোখে বারেকের জন্য তাকালাম। ওর লালচে চোখ দেখেই বোঝা যায়, মেয়েটা বাকি রাতটুকু আর ঘুমায়নি।

চা খেলাম। বেশ লাগলো। টি ব্যাগ ইউজ করলেও দুধ ঘন করে ফুটিয়েছে। সম্ভবত ব্যাগ ছিঁড়ে গরম পানিতে দিয়েছে। বেশ মজাদার চা হয়েছে—অনেকদিন এমন দেশী স্বাদের চা খাই নি। এবারও কৃতজ্ঞতা মনে মনে প্রকাশ করলাম।

কাপড়ের ব্যাগ গোছাতে এসে আর একবার মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম ওকে। সব কিছু গুছিয়ে দিয়েছে, এমনকি টুথপিক পর্যন্ত। নতুন করে কিছু আর ব্যাগে ঢোকাবার কথা মনে পড়লো না। আমার সামনেই রেজার, ব্লেড, ক্রিম সব ঢোকালো।

'আর তো দেরি করা যায় না। কার্ড চার্জ করে কিছু নগদও তো হাতে রাখতে হবে।' কথাটা সোনিয়াকেই বললাম, কিন্তু পরোক্ষভাবে।

'আমি তোমাকে পৌঁছে দিতে যাব

'না।'

কথাটা বলতেই ওর মুখটা অন্ধকার হয়ে গেলো। আমি আসলে

কথাটা মোলায়েম করেই বলেছিলাম। কিন্তু ও ভুল বুঝেছে। ঘড়ি দেখলাম। হাতে সময় আছে। 'তুমি বরং আমার সাথে একটু বের হও। ব্যাংকে যাবো পরে তোমায় নামিয়ে রেখে যাবো।'

গাড়ি পার্কিং করাই ছিলো। সামনের দরজা খুলে দিলাম। সোনিয়া কোন প্রশ্ন না করেই বসলো। এই প্রথম ও আমার পাশে আমেরিকাতে।

ব্যাংকে গেলাম। কার্ড চার্জ করে কিছু নগদ টাকা তুললাম। সোনিয়া আমার সাথেই। 'আমি ক'টা ব্লাঙ্ক চেক সই করে রেখে যাবো। এখান থেকে ভাঙ্গাবে। প্রয়োজনের বেশিই অংকটা লিখবে।'

সোনিয়ার দু'চোখ ছলছলে। গাড়িতে উঠেই ও কেঁদে ফেললো। আমি কিছু বললাম না। শুধু রুমালটা ওর দিকে বাম হাতে বাড়িয়ে দিলাম। ডান হাতে ষ্টেয়ারিং ধরা না থাকলে ডান হাতেই ওটা মুছে দিতাম। 'নগদ কিছু ডলার তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি, আশাকরি, এগুলো শেষ হবার আগেই চলে আসবো। আর লিণ্ডার ফোন নম্বর রেখে যাবো। কোন রকম বিশেষ প্রয়োজন হলে ওকে কল দেবে। ভাবনার কিছু নেই। কোন বিপদ বা শরীর অসুস্থ হলে ৯১১ এ কল দেবে। ওরাই তোমাকে সাহায্য করবে। তোমার ভিসা তো আছে, কোন অসুবিধা হবে না।'

লিণ্ডার নামটা উচ্চারণ করা বোধহয় উচিত হয়নি। দপ করে যেন সোনিয়ার মুখটা নিভে গেলো। অবশ্য একটা উপকার হলো, হঠাৎ করেই ওর চোখের পানি বন্ধ হয়ে গেলো, চোয়াল শক্ত হলো।

ঘরে এলাম। চেক সই করে রাখলাম। কিছু ডলার রাখলাম। ক'টা ঠিকানা লিখলাম। হাতের ঘড়ি দেখলাম। আর দেরি করা উচিত হবে না। 'এয়ারপোর্ট আমি ক্যাব ভাড়া করে যাবো। পোর্ট বেশ দূরে, একা আসতে অসুবিধা হবে, না হলে নিয়ে যেতাম। তাছাড়া দরকার নেই।'

ব্যাগটা হাতে নিলাম। সুটকেসের নিচে চাকা আছে, টেনে গেট পর্যন্ত আনলাম। 'এখানে চুরি টুরি হয় না। তবুও সাবধানে থেকো। মাঝে মাঝে বের হয়ে নিচে ঘুরবে, ভালো লাগবে। মন খারাপ লাগলে দেশে ফোন করবে। বাংলাদেশের কোড লিখে রেখে এসেছি। ডাইরেকট ডায়াল করবে। বিলের কথা ভাববে না। রোজই ফোন করতে পারো।'

সোনিয়া ভীষণ কাঁদছে। বার বার নাক টানছে। আমারও খুব খারাপ লাগছে। দরজার কাছে আমি এসে গেছি। ও হয়তো এ সময় আমার বুকে পড়েই কাঁদতে চাইছে। বুঝি, কিন্তু কি এক অজানা দূরত্ব, যা ঘোচাতে পারলাম না। বুকে টেনে নিয়ে ওর কান্নাও বন্ধ করতে পারলাম না।

আমি দরজা পার হয়ে বের হয়ে এলাম। দাঁড়ালাম। সরাসরি ওর মুখের দিকে শেষ বারের মতো তাকালাম। চোখটা আমার ছলছল করে উঠলো। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম।

'আমাকে কিছু বলে যাবে না শিমুল।'

কি করুণ আকুতি ওর কথায়। হৃদয় স্পর্শ করা কথা। কিন্তু কি বলবো? কি বলার আছে? কি বলা যায়?

কিন্তু ও কি শুনতে চায় ? ও-কি আমার মুখ থেকে সেই কথাটি শুনতে চাচ্ছে ? সেই সম্ভাষণ—সুইট হার্ট। কিন্তু আমি পারি না। সে কথা আমি আর ওকে বলতে পারি না। অতীত আমি যতটুকু ভুলেছি, তা অনেক কষ্টে। আবার সেই ক্ষতকে উস্কে দিতে পারবো না।

'কিছুই বলার নেই শিমু ?'

আমি জানি এটা আবেগ ওর। কিন্তু আমি আবেগের বেড়া তো অনেকটাই ডিঙ্গিয়ে ফেলেছি। ও কে ভালোবেসে। নামটা উচ্চারণ করতে চাই না এই মুহূর্তে। মাথায় রক্ত চড়ে যাবে। চিৎকার করে বলতে মন চাইছে—পারবো না সোনিয়া, পারবো না "সুইট হার্ট" বলে আবারও বুকে জড়িয়ে নিতে।

'একটা কিছু বলে যাও শিমু

ব্যাগটা টেনে নিলাম। দু'পা সামনে বাড়লাম। শেষ বারের মতো পিছন ফিরে তাকালাম। ক্রন্দনরতা সোনিয়াকে দেখে কিছু একটা বলা উচিত মনে করলাম। ওর মুখটা দেখে আমারও চোখে পানি এসে গেলো। মুছে নিলাম অনেক কষ্টে, গলাটা পরিস্কার করে বললাম, 'লিণ্ডার সঙ্গে কাল সকালের ব্যবহারটা শুধু তোমাকে, দেখাবার জন্যই। ও শুধুই আমার একজন ভালো বন্ধু মাত্র। আমার আর বলার কিছু নেই।'

দুপদাপ পা ফেলে গেট বন্ধ করে বের হয়ে এলাম। আর পিছন ফিরে তাকায়নি। জানি, সোনিয়া পিছনে তখনও দাঁড়িয়ে। আরো জানি, সোনিয়ার দু'চোখে পানির বন্যা নেমেছে।

আরো কিছুক্ষণ পর।

মেঘের আড়ালে বিরাট লৌহ দানবটা আমাকে নিয়ে হারিয়ে গেলো। বিশাল আকাশ প্রকাণ্ড প্লেনটাকে ক্ষণিকেই গিলে ফেললো। মেঘের আড়ালে চলে গেলো। নীচে রেখে গেলো শুধু ক্রন্দনরতা সোনিয়াকে।

সোনিয়া কাঁদছে।

এবং

শেষ।

শুরু করেছিলাম, "আমি কাঁদছি" শিমুলের কান্না দিয়ে, আর শেষ করলাম "সোনিয়া কাঁদছে" অর্থাৎ সোনিয়ার কান্না দিয়ে।

কিন্তু তারপর ?

এই কান্নার শেষ কোথায় ?

হয়তো আছে, হয়তো নেই।

নদীর মতো।

নদী তো সমুদ্রে গিয়ে শেষ হয়, সবাই জানি। সত্যিই কি সেখানে তার শেষ হয় ?

যে যা মনে করেন, কেউ মনে করেন সমুদ্রে মিশে নদী আবারও নতুন করে চলতে শেখে অথবা না।

তেমনিই শিমুল আর সোনিয়া।

হয়তো এখানেই ওদের চলা শেষ, নয়তো নতুন করে শুরু। নিজের মতো করে সমাপ্তিটুকু টেনে নিন। এবং আপনার মতামতটা লিখে জানান। কাহিনী আপাততঃ শেষ (সুইট হার্ট—২)। কিন্তু ওদের শেষ পরিণতি, আরো জানার কি দরকার আছে ? আপনার মতামত জানার জন্য আমার (এহসান) অপেক্ষা শুরু।

সমাপ্ত